সূচিপত্র

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

■ ১০বর্ষ ■ ৫ম সংখ্যা ■ মার্চ ২০২৬

Web : www.al-itisam.com



রামাযান ঈদ বিশেষ সংখ্যা

কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে
প্রবন্ধ, ফিচার, মাসায়েল ও প্রশ্নোত্তর

www.al-itisam.com

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:١٠، رمضان و شوال ١٤٤٧هـ/مارس ٢٠٢٤م العدد: ٥ ، الجزء :١١٣
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير : فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

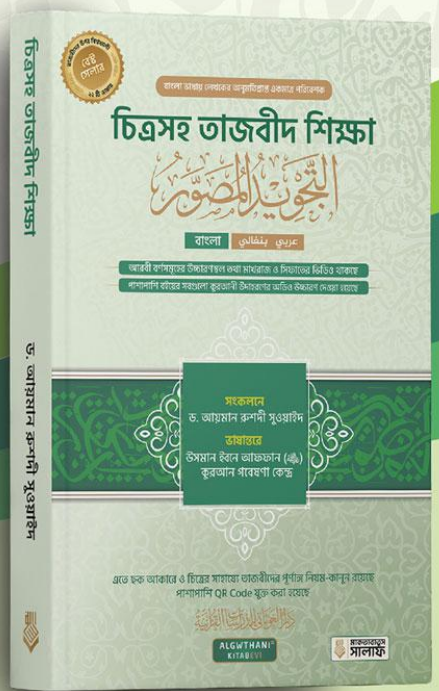
চিত্রসহ তাজবীদ শিক্ষা

(আত-তাজবীদুল মুসাওওয়ার)

তাজবীদের উপর বিশ্বব্যাপী বেস্ট সেলার ২২ টি ভাষায়

- ২২ টি ভাষায় অনূদিত ও বহুল প্রচলিত আধুনিককালে তাজবীদের উপর লিখিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী একটি বই হলো 'আত-তাজবীদুল মুসাওওয়ার' অর্থাৎ চিত্রসহ তাজবীদ শিক্ষা
- বইটিতে সহজ পদ্ধতিতে আরবী হরফসমূহের উচ্চারণস্থল তথা মাখরাজ ও সিফাতের উচ্চারণস্থল ও উচ্চারণপদ্ধতি ভিডিও ও ছবি আকারে দেওয়া আছে।
- পাশাপাশি বইয়ের সবগুলো কুরআনী উদাহরণের অডিও উচ্চারণ দেওয়া থাকছে
- এতে ছক আকারে ও চিত্রের সাহায্যে তাজবীদের পূর্ণাঙ্গ নিয়ম কানুন রয়েছে
- অডিও-ভিডিও এর QR Code যুক্ত করা হয়েছে। এতে খুব সহজেই মোবাইল ফোন দিয়েই স্ক্যান করে ভিডিও দেখে মুখের অঙ্গভঙ্গি আয়ত্ব করা যাবে।

100g Glossy | 4 Color | Board Binding



রামাযান উপলক্ষে

মাসিক আল-ইতিছাম গ্রাহক ও এজেন্টের জন্য বিশেষ ছাড়

~~মূল্য : ৫৯০ টাকা~~ মূল্য : ৫০০ টাকা

ORDER 01407-021847 MaktabatusSalaf

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

১০ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মার্চ ২০২৬ইং,
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩২বঙ্গাব্দ, রমজান-শাওয়াল ১৪৪৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مجلة الإعتصام الشهرية

www.al-itisam.com

উপদেষ্টা

শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক

মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক

মো. আকরাম হোসেন
আব্দুল্লাহ মাহমুদ

বিভাগীয় সম্পাদক

মো: নাসির উদ্দিন, আল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মোঃ নাইমুল ইসলাম

ফাতাওয়া হটলাইন: ০১৪০৭-০২১৮৪২ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ

প্রধান সম্পাদক

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০
সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার

০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট
monthlyalitisam@gmail.com

সূচিপত্র

» **সম্পাদকীয় ॥ ০২**

» **প্রবন্ধ**

ছিয়াম বিষয়ক আধুনিক মাসআলা-মাসায়েল ৫
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী ৫

ছিয়ামের ইতিহাস: তাক্বওয়া ও আত্মশুদ্ধি ৯
আবু আল-মিনান মো. আল-আমিন ৯

ছিয়ামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১২
সাইফুল্লাহ আল-মামুন মাদানী ১২

শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাস রামাযান ১৪
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

ছিয়াম পালনকারীর জন্য দশটি নছীহত ১৫
পরিমার্জিত অনুবাদ: তাওহীদুর রহমান সালাফী

রামাযানে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত ১৭
আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস

ই'তিকাফ প্রসঙ্গ ১৯
অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

লায়লাতুল ক্বদর: সুযোগ হারাবার আগেই জেগে উঠুন! ২০
হুসাইন আহমাদ আল-ইয়াদী

ছোটদের ছিয়াম ২২
রাকিব আলী

রামাযানের শিক্ষা সারা বছরের পাথেয় ২৩
অনুবাদ: আব্দুল মোমিন তাজেমুল হক

ঈদের মাসায়েল ২৬

শাওয়াল মাসের ছিয়ামের গুরুত্ব ২৮
ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

» **ফাযায়েলে আমল**

রামাযান ও ছিয়াম সংক্রান্ত ৩১
মাহবুবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)

» **সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন**
ক্বিয়ামুল লায়ল ও বিতর ৩২

» **দিশারী**
যাকাত দিলে সম্পদ যেভাবে বাড়ে ৩৪
রাকিব আলী

» **নারীদের পাতা**
নারীর ছিয়াম: শরীআত ও বাস্তব দিকনির্দেশনা ৩৫
মো. আকরাম হোসেন

» **জামি'আহ পাতা**
রামাযান: তাক্বওয়া নির্মাণের নববী কর্মশালা ৩৬
আদিল বিন ফোরকান

» **হেলথ কর্নার**
রামাযানে পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস: সুস্থভাবে ছিয়াম পালনের উপায় ৩৮
ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

» **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান**
সাদা পাঞ্জাবী ৩৯
মাজহারুল ইসলাম আবির

» **কবিতা ৪২** » **সংবাদ ৪৩** » **সওয়াল-জওয়াব ৪৫**



সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ইসলামপন্থিদের ভবিষ্যৎ পথরেখা

গত ১২ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসের ১৩তম জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, যা জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের একটি অন্যতম ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। নির্বাচনে বড় ধরনের কোনো সহিংসতা, হানাহানি, ভোট কারচুপি বা কেন্দ্র দখলের ঘটনা ঘটেনি বললেই চলে। তবে ফলাফল ঘোষণায় কিছুটা 'ইঞ্জিনিয়ারিং' করা হয়েছে মর্মে জামায়াত-এনসিপি জোটের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

উক্ত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে প্রায় একটানা চার দিনের ছুটি থাকা এবং একটি নির্ধারিত সময়ে সকল যানবাহন, দোকানপাট ও আর্থিক লেনদেন (বিকাশসহ) বন্ধ থাকায় সমগ্র বাংলাদেশে নির্বাচনের একটি বিশেষ পরিবেশ তৈরি হয়। ঢাকা থেকে হাজার হাজার মানুষকে শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য নিজ গ্রামে ফিরে যেতে দেখা যায়। এই ধরনের উৎসবমুখর পরিবেশে অতীতে কখনো নির্বাচন আয়োজন হয়নি, যা বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম একটি সফলতা।

নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সারা দেশব্যাপী, বিশেষ করে অনলাইনে একটি ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, জামায়াত ও এনসিপি জোট হয়তো ক্ষমতায় আসছে। কারণ তাদের সাথে অসংখ্য ইসলামী দল যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি; বরং বিএনপি জোট ২১২টি আসন এবং জামায়াত-এনসিপি জোট ৭৭টি আসন লাভ করে। উল্লেখ্য, ৫০টিরও বেশি আসনে জামায়াত-এনসিপি জোট ৫ হাজারেরও কম ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে।

বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা অন্য কোনো দলের মুখাপেক্ষী থাকবে না, যা অনেকের মনে নতুন করে স্বৈরাচারী শাসনের আতঙ্ক তৈরি করেছে। পাশাপাশি 'জুলাই সনদ' বাস্তবায়ন না হওয়ার সন্দেহও দেখা দিয়েছে। যদিও গণভোটে 'জুলাই সনদ' জয়যুক্ত হয়েছে, তবুও বিজয়ী দল বিএনপির অনেক বিষয়ে দ্বিমত (Note of Dissent) থাকায় তারা সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নাও করতে পারে। এছাড়া অতীতে বিজয়ী ও পরাজিত দলের মধ্যে যে প্রতিহিংসার রাজনীতি দেখা গেছে, পুনরায় তার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা করা হচ্ছে—যেমন রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধা বিভাজন, গুপ্তনামে গ্রেফতার বা ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার মতো নৈরাজ্য।

আমরা শুরু থেকেই বলে এসেছি, গণতন্ত্র কখনোই দেশে ন্যায় ও ইনছাফ বা স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। গণতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। নির্বাচনে ইসলামপন্থি দল ও আলেম-উলামাদের মধ্যে যে কাদা ছোড়াছুড়ি, মতবিরোধ ও জোট ভাঙার খেলা দেখা গেছে, তা প্রমাণ করে যে, ভোটের রাজনীতি আলেমদের সম্মান শুধু নষ্টই করে না, বরং অপমানিতও করে। যেমন—ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি আসনে বিএনপি জোট, জামায়াত-এনসিপি জোট এবং ইসলামী আন্দোলনের তিনজন আলেম প্রার্থীর বিপরীতে একজন নারী প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। এটি আলেম-উলামাদের পারস্পরিক অনৈক্য ও আস্থাহীনতার একটি লজ্জাজনক উদাহরণ।

শুধু তাই নয়, বিএনপি জোটের অন্তর্ভুক্ত ৪ জন আলেম, জামায়াত জোট থেকে বের হয়ে যাওয়া চরমোনাই পীর ও জামায়াত জোটে থাকা মাওলানা মামুনুল হক, কেউই এই

নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারেনি। তথা আলেমদের মধ্যে শুধু মনোমালিন্য তৈরি হলো, বিভেদ ও কাদা ছোড়াছুড়ি হলো দিনশেষে বাস্তব মাঠে ফলাফল শূন্য।

গণতান্ত্রিক ভোটের রাজনীতিতে বিপুলভাবে বিজয়ী হওয়ার জন্য একজন 'কাল্ট ফিগার' (Cult Figure) বা ক্যারিশম্যাটিক নেতা থাকা অতীব জরুরী, যার অধীনে বিশাল কর্মী বাহিনী সারা দেশে জোয়ার তৈরি করবে। যেমন—আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান, বিএনপির জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া কিংবা পাকিস্তানের ইমরান খান। এই ধরনের নেতা ছাড়া পৃথিবীতে কোনো বিপ্লব বা নির্বাচনে সফল হওয়া সম্ভব নয়; যেমনটি সিরিয়ার আহমাদ আল-শারা, আফগানিস্তানের তালেবানদের আমীরুল মুমিনীন কিংবা ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ আল-খামেনীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাদের সফলতার কারণই হচ্ছে অবিসংবাদিত নেতৃত্ব থাকা।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশের ইসলামপন্থিরা শত মত, দল ও মাযহাবে বিভক্ত। এক দল অন্য দলকে অনেক সময় কুফরী বা শিরকী হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে তাদের মধ্যে কোনো অবিসংবাদিত নেতা তৈরি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাশাপাশি, অনেক ইসলামী দলের ফ্রেমিং বা গঠনতন্ত্র এমন যেখানে শূরা-ভিত্তিক ও যোগ্যতা-ভিত্তিক কর্মী ও নেতা এসে থাকে। ফলত, কোনো নেতাই সেখানে দীর্ঘদিন থেকে নিজের ক্যারিশম্যাটিক লিডারশিপকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন—এরকম সুযোগ তৈরি হয় না। এটিও আরেকটি বড় সমস্যা।

ইসলামপন্থি দলগুলোর পক্ষে আরও একটি কারণে ভোটের রাজনীতিতে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব নয়; সেটি হচ্ছে 'ডিপস্টেট' বা ছায়া রাষ্ট্র। এই নির্বাচনেও যতটুকু রেজাল্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কথা শোনা যাচ্ছে, সেটির ক্ষেত্রে সকলে এটিই আলোচনা করছেন যে, এটি ডিপস্টেটের চাওয়া অনুযায়ী হয়েছে বা হয়ে থাকে। ডিপস্টেট সাধারণত দেখে—বিদেশি এম্বাসি এবং বিদেশি রাষ্ট্রগুলো কী চায়? পাশাপাশি দেশের সেনাবাহিনীসহ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শক্তিশালী মিডিয়া তারা কী চায়? তথা দেশের পারমানেন্ট বা স্থায়ী স্টেকহোল্ডার কারা, তাদের চিন্তা-চেতনা এবং সিদ্ধান্তের ওপর এটি নির্ভর করে।

আর ইসলামপন্থি দল যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করে, তাদের জন্য এই ধরনের ডিপস্টেটকে ডিল করা অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়। কেননা, যে সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে তাদের আস্থা অর্জন করা যাবে, সে সমস্ত বিষয়গুলোর অনেকাংশই ইসলাম বিরোধী। যেমনটি আমরা এই নির্বাচনেও দেখেছি—যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করেছেন তারাও চেষ্টা করেছেন নিজেদের খোলস থেকে বের হয়ে আসতে এবং সেকুলারিজমের যতগুলো অনুষঙ্গ আছে তার সবগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করতে। হিন্দুদের মন্দির পাহারা দেওয়া থেকে শুরু করে ছওমের সাথে মূর্তিপূজার তুলনা করা—এমনকি 'ইসলামী শরীআহ আইন বাস্তবায়ন করব না', 'মেয়েরা চাইলে বেপর্দায় ঘুরে বেড়াতে পারবে, কাউকে পর্দা করতে বাধ্য করা হবে না'—অসংখ্য এ জাতীয় কথা ইসলামী দলগুলো বলার এবং বুঝানোর চেষ্টা করেছে। কেননা তারা ডিপস্টেটের আস্থা অর্জন করতে চেয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, এই বিষয়গুলো যখন আমরা ইসলামের নামে বলব, তখন সেটি মূলত দীর্ঘমেয়াদে ইসলাম এবং মুসলিমদের যে নিষ্কলুষ আদর্শ সেটিকে কলুষিত করে।

ফলত, যারা আসলে 'মন্দের ভালো' হিসেবে গণতন্ত্রের রাজনীতি করতে চান, তাদের উচিত ইসলামের নামে রাজনীতি না করা। তাদের উচিত স্বাভাবিক মুসলিম হিসেবে ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এবং সাধারণ ন্যায় ও ইনছাফের কথা বলে যতটুকু সম্ভব কল্যাণমূলক রাষ্ট্র করা যায়, সেটির চেষ্টা করা। যেমনটি তুরস্কের এরদোগান অথবা পাকিস্তানের ইমরান খান অথবা মালয়েশিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো করে থাকে।

সেক্ষেত্রে ইসলামপন্থি দলগুলোর জন্য সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হতে পারে ভারতের আরএসএস এবং বিজেপির রাজনৈতিক মডেল। আরএসএস, শিবসেনা এবং বজরং দলের যে কট্টর হিন্দুত্ববাদ, সেটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা একটি মডারেট হিন্দুদের দিয়ে রাজনৈতিক দল তৈরি করেছে যার নাম বিজেপি। বিজেপির যারা রাজনীতিবিদ তারা কোনো সাধু-সন্ত বা সন্ন্যাসী নন, বরং তারা স্বাভাবিক হিন্দু। কিন্তু পিছন থেকে আরএসএস (যারা কট্টর হিন্দুত্ববাদী) তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং রাজনীতির মাঠে টিকে থাকা ও এগিয়ে যাওয়ার সকল সহযোগিতা প্রদান করে।

বাংলাদেশেও যদি ইসলামপন্থি দলগুলো এরকম সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমদের কোনো রাজনৈতিক দলকে সামনের দিকে

এগিয়ে দেয় (যেমন জুলাইয়ের ছাত্রনেতাদের মাধ্যমে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক দল এনসিপি) এবং পিছন থেকে সকল সহযোগিতা করে, তবে এখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত, ছাত্রদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হবে এবং তার 'কাল্ট ফিগার' তৈরি হবে। যেমন ইতোমধ্যে ওসমান হাদীর একটি কাল্ট ফিগার তৈরি হয়ে গেছে, যিনি ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ছিলেন। এরকম একজন নেতাকে সামনে রেখে তারা সমগ্র দেশব্যাপী একটি জোয়ার তৈরি করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু তারা সরাসরি ইসলামী দল নয়, তাই তারা ডিপস্টেটের আস্থা অর্জন করতে পারবে। আবার যেহেতু তারা ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত বা ইসলামী দলগুলো তাদের সাপোর্ট দিচ্ছে, সেহেতু তারা ইসলাম বিরোধী কোনো কিছু করবে না এবং ন্যায়-ইনছাফ প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

অন্যদিকে আমাদের পরামর্শ—যারা বিজয়ী হয়েছেন (বিএনপি জোট), তারাও চাইলে জনগণের এই একই চাওয়া পূরণ করার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে। জনগণের মধ্যে তাদের আস্থা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে পারে। কেননা জুলাই পরবর্তী সিচুয়েশনে বাংলাদেশের মানুষ আধিপত্যবাদ থেকে মুক্তি চায়। মানুষ আর 'মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার' নামে বিভাজনের ভারতীয় কোনো রাজনৈতিক বয়ান বাংলাদেশে দেখতে চায় না। মানুষ একটি ঐক্যবদ্ধ, সুন্দর, দুর্নীতিমুক্ত, চাঁদামুক্ত ও আধিপত্যবাদমুক্ত বাংলাদেশ চায়। যদি বিজয়ী বিএনপি সরকার এই চাওয়া পূরণ করতে পারে, তবে তারাই জনগণের ব্যাপক ভালোবাসা পেয়ে বিজয়ী হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে। সুতরাং তাদের কাছে এবং তাদের নেতার কাছে আমরা এই কল্যাণের দাবি ও পরামর্শ রেখে যাচ্ছি।

সর্বোপরি, যারা বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন এবং জানেন যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়, তাদের কাজ হচ্ছে প্রস্তুতি নেওয়া। যেহেতু গণতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইনছাফ প্রতিষ্ঠিত হবে না, সেহেতু যতদিন গণতন্ত্র আছে ততদিন যুলুম থাকবে। আর যুলুম যতদিন থাকবে, মানুষ যুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবেই। ফলে প্রতি ১০, ১৫ বা ২০ বছর পর পর এরকম '৩৬শে জুলাই' বারবার ফিরে আসবে। কিন্তু যখন এরকম সময় ফিরে আসবে, তখন যদি ইসলামপন্থিদের কোনো একক অবিসংবাদিত নেতা না থাকে যার অধীনে বিশাল কর্মীবাহিনী রয়েছে, তবে ২০২৪-এর জুলাই যেভাবে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবে পরিণত হয়নি, সামনের কোনো গণঅভ্যুত্থানকেও বিপ্লবে পরিণত করা সম্ভব হবে না।

সেক্ষেত্রে প্রস্তুতি থাকতে হবে অনেক ব্যাপক। এই প্রস্তুতি শুরু হবে ঈমান বিল গায়েবে ইয়াক্বীনের মাধ্যমে, পরকালে আস্থার মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ন্যায়পরায়ণতার চর্চার মাধ্যমে। 'আল-আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার'-এর চর্চা বাড়ানোর মাধ্যমেই প্রকৃত নেতা তৈরি হয়। সর্বোপরি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি এবং একজন অবিসংবাদিত নেতার নেতৃত্বের পিছনে একত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

অনেকেই হয়তো মনে করবেন, তাহলে কখন এই গণতন্ত্র বিদায় নিবে এবং কখন ইসলাম প্রতিষ্ঠা হবে? তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই—এখানে হতাশার কিছু নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মূলনীতি অনুযায়ী কোনো আদর্শ, মতবাদ বা সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন টিকে থাকে না। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে, তিনি মানুষকে যুলুম থেকে বাঁচানোর জন্যই একজনের হাতে ক্ষমতা দীর্ঘদিন রাখেন না বরং তা পরিবর্তন করে দেন। ফলত আমরা দেখেছি ইংল্যান্ড একসময় বিশ্বের সুপারপাওয়ার ছিল তাদের পতন হয়েছে। তারপর রাশিয়ার পতন হয়েছে। এখন আমেরিকা সুপারপাওয়ার আছে। সুতরাং আমেরিকারও একদিন পতন হবে। আর এই গণতান্ত্রিক আদর্শের সবচেয়ে বড় ধারক-বাহক হচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকার পতনের সাথে সাথেই গণতন্ত্রের এই মতবাদটি 'বাই ডিফল্ট' ও 'বাই ন্যাচার' ধসে পড়বে। তখনই মুসলিমদের জন্য সুযোগ থাকবে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার।

সেক্ষেত্রে পূর্ব-প্রস্তুতির কোনো বিকল্প নেই। তাই আমি উদাত্ত আহ্বান জানাব নতুন প্রজন্মকে, যারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের স্বপ্ন দেখে—তাদেরকে ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করার। যেন আগামী ১৫, ২০ বা ৩০ বছর পর যখন পুনরায় যুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠবে, তখন যেন তাদের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকে, অবিসংবাদিত নেতা থাকে এবং তাদের মধ্যে শতভাগ ন্যায় ও ইনছাফের চর্চা থাকে। তাদের যেন ঈমান বিল গায়েব, ইয়াক্বীন ও পরকালে পূর্ণাঙ্গ আস্থা থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের দেশকে কবুল করুন। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মুশরিকদের পদানত হওয়া এবং তাদের অধঃস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহুম্মা আমীন! *(প্র. স.)*

ছিয়াম বিষয়ক আধুনিক মাসআলা-মাসায়েল

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

ভূমিকা: দ্বীন ইসলাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। বর্তমান যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে এমন কিছু বিষয় সামনে এসেছে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল না। নিচে ছিয়াম বিষয়ক এমন কিছু মাসআলা-মাসায়েল তুলে ধরা হলো:

(১) আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চাঁদ দেখা:

বিবরণ: খালি চোখে চাঁদ দেখাই শরীআতের মূলনীতি হলেও বর্তমান যুগে টেলিস্কোপ বা আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চাঁদ দেখার বিধান কী?

পর্যালোচনা: অধিকাংশ আধুনিক আলেমের মতে, যেকোনো উপায়ে চাঁদ দেখা নিশ্চিত হওয়াই মূল উদ্দেশ্য। সঊদী আরবের 'মাজলিসু হাইআতি কিবারিল ওলামা' সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, যদি টেলিস্কোপের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে চাঁদ দেখা যায়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে— যদিও তা খালি চোখে দেখা না যায়। হাদীছে দেখার মাধ্যম নির্দিষ্ট করা হয়নি, বরং 'দর্শন'কে শর্ত করা হয়েছে।

(২) জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব:

বিবরণ: বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অত্যন্ত সূক্ষ্ম। চাঁদ দেখা যাওয়ার আগেই কি এই হিসাবের ওপর ভিত্তি করে রামাযান বা ঈদ ঘোষণা করা যাবে?

পর্যালোচনা: শরীআতের বিধান হলো- আকাশ পরিষ্কার থাকলে কেবল চাঁদ দেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে বা কারো চাঁদ দেখার সাক্ষ্য নিয়ে সন্দেহ হলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবকে 'সহায়ক' হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেবল হিসাবের ওপর নির্ভর করে ছিয়াম শুরু বা শেষ করা জায়েয নয়।

(৩) চাঁদ দেখার উদয়স্থলের ভিন্নতা:

বিবরণ: পৃথিবীর এক প্রান্তের চাঁদ দেখা কি অন্য প্রান্তের মানুষের জন্য প্রযোজ্য? নাকি ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উদয়স্থলের ভিন্নতা অনুযায়ী আলাদা আলাদা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দিনে ছিয়াম বা ঈদ পালন করা যাবে?

পর্যালোচনা: উদয়স্থলের ভিন্নতা একটি বাস্তব ও প্রমাণিত বিষয়। নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী, প্রতিটি ভূখণ্ডের বা দেশের মানুষ তাদের নিজস্ব চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে ছিয়াম পালন করবে। এটি শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা, শায়খ ইবনে বায এবং শায়খ ইবনে উছায়মীন রহিমাহুমুল্লাহ-এর অভিমত। আন্তর্জাতিক ফিক্বহ অ্যাকাডেমিও একই সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তারা মনে করেন, ঈদ বা ছিয়াম সারাবিশ্বে একদিনে পালন করার চেয়ে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী নিজ নিজ স্থানে চাঁদ দেখে আমল করাই উম্মাহর প্রকৃত ঐক্যের ভিত্তি।

(৪) বিমান যাত্রীর ইফতার ও সূর্যোদয়:

বিবরণ: কোনো ব্যক্তি জমিনে সূর্যাস্ত দেখে ইফতার করল, কিন্তু বিমান উড্ডয়নের পর উচ্চতার কারণে পুনরায় সূর্য দেখতে পেল। তার বিধান কী?

পর্যালোচনা: সঊদী ফাতাওয়া বোর্ড ও শায়খ উছায়মীনের মতে, তার ছিয়াম বিশুদ্ধ এবং সে খানা-পিনা চালিয়ে যেতে পারবে। কারণ সে শারঈ দলীলের ভিত্তিতে ইফতার করেছে, তাই নতুন কোনো দলীল ছাড়া তা বাতিল হবে না।

(৫) আরামদায়ক বাহনে ভ্রমণকারীর ছিয়াম ভঙ্গের অনুমতি:

বিবরণ: প্রাচীনকালে সফর ছিল অত্যন্ত কষ্টের। এখন বিমান বা এসিতে সফর করলে কষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় কি সফরকারী ছিয়াম ভাঙতে পারবে?

পর্যালোচনা: সফর আরামদায়ক হলেও মুসাফিরের জন্য ছিয়াম না রাখার সুযোগ বহাল থাকবে। ইসলামে সফরকে শর্ত করা হয়েছে, সফর 'কষ্টকর' হওয়াকে আবশ্যিক শর্ত করা হয়নি।

(৬) দীর্ঘ দিন বা রাতের দেশে ছিয়াম:

বিবরণ: যেসব দেশে দিন বা রাত ২৪ ঘণ্টার বেশি দীর্ঘ অথবা দিন অস্বাভাবিক বড় (২০ ঘণ্টার বেশি), তারা কীভাবে ছিয়াম পালন করবে?

পর্যালোচনা: ১. যেখানে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার বেশি, সেখানে নিকটতম স্বাভাবিক দেশের সময় অনুযায়ী 'হিসাব' (Estimate) করতে হবে। ২. যেখানে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আবর্তিত হয় (যেমন ২০ ঘণ্টা দিন), সেখানে ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়াম পালন ওয়াজিব, যদি না জীবনহানির

* বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

www.al-itisam.com

শঙ্কা থাকে। দাজ্জাল-সংক্রান্ত হাদীছে রাসূল ﷺ দীর্ঘ দিনের ক্ষেত্রে সময় অনুমান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(৭) কুলি (গার্গল) এবং মুখে ব্যবহারের স্প্রে:

বিবরণ: ছিয়াম অবস্থায় গলা পরিষ্কার বা ব্যথার জন্য কুলি (Gargling) করা অথবা মুখের ভেতরে ব্যবহারের ঔষধযুক্ত স্প্রে (Oral Spray) ব্যবহার করার বিধান কী?

পর্যালোচনা: এগুলো ব্যবহারের কারণে ছিয়াম নষ্ট হবে না। তবে শর্ত হলো, গার্গল করার সময় পানি বা স্প্রে করার সময় ঔষধের কোনো অংশ যেন কোনোভাবেই কণ্ঠনালি অতিক্রম করে পেটে চলে না যায়। এই মাসআলাটি কুলি করা বা মেসওয়াক করার মাসআলার অন্তর্ভুক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু সরাসরি খাদ্যনালি দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ ছিয়াম নষ্ট হয় না।

(৮) ইনহেলার বা পাফার ব্যবহারের বিধান:

বিবরণ: এ্যাজমা রোগীদের ব্যবহৃত ইনহেলারের অতি সামান্য অংশ পাকস্থলীতে পৌঁছাতে পারে। এতে ছিয়াম ভাঙবে কি?

পর্যালোচনা: এতে ছিয়াম নষ্ট হবে না। কারণ পাকস্থলীতে যে পরিমাণ ওষুধ যায় তা এক ফোঁটারও কম এবং তা কুলি করার পর অবশিষ্ট পানির চেয়েও নগণ্য। রাসূল ﷺ ছিয়াম অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতেন। মিসওয়াকের রাসায়নিক উপাদান যেভাবে লালার সাথে পেটে যায়, ইনহেলারও তদ্রূপ।

(৯) অক্সিজেন গ্রহণ:

বিবরণ: শ্বাসকষ্টে রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া হয়, এর বিধান কী?

পর্যালোচনা: অক্সিজেন দিলে ছিয়াম নষ্ট হয় না। কারণ এটি কোনো খাদ্য বা পানীয় নয়। এটি পাকস্থলীতে পুষ্টি সরবরাহ করে না।

(১০) জিহ্বার নিচে রাখার ট্যাবলেট (Sublingual Tablet):

বিবরণ: হার্ট অ্যাটাকের মতো জরুরী অবস্থায় অনেক সময় জিহ্বার নিচে বিশেষ ট্যাবলেট রাখা হয়। এতে ছিয়াম ভাঙবে কি?

পর্যালোচনা: এটি জায়েয এবং এতে ছিয়াম নষ্ট হয় না। তবে শর্ত হলো, লালার সাথে ঔষধের কোনো অংশ গিলে ফেলা যাবে না। এই ঔষধটি জিহ্বার নিচ থেকে সরাসরি রক্তের মাধ্যমে হৃদপিণ্ডে পৌঁছে যায় এবং এটি খাদ্যনালি দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে না। তবে, জরুরী অবস্থা ছাড়া এটা এড়িয়ে চলা উচিত।

(১১) কানের ড্রপ ও কান পরিষ্কার করা (Ear Wash):

বিবরণ: ছিয়াম অবস্থায় কানে ঔষধের ড্রপ দেওয়া অথবা কোনো তরল বা সলিউশন দিয়ে কান পরিষ্কার করার বিধান।

পর্যালোচনা: নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী, কানে ড্রপ দিলে বা কান পরিষ্কার করলে ছিয়াম নষ্ট হয় না। কারণ কান মূলত কণ্ঠনালির সাথে সরাসরি যুক্ত কোনো ছিদ্র বা পথ নয়। তবে যদি কারও কানের পর্দা ফাটা থাকে এবং ঔষধ বা পানি কণ্ঠনালিতে পৌঁছে যায়, তবে বিষয়টি লক্ষ্যণীয়: যদি তা পরিমাণে খুব সামান্য হয় (যেমন ওযু বা কুলির পর মুখে লেগে থাকা অবশিষ্ট আর্দ্রতা), তবে তা ক্ষমাযোগ্য এবং ছিয়াম নষ্ট হবে না। কিন্তু যদি কান পরিষ্কার করার সময় অধিক পরিমাণে তরল কণ্ঠনালিতে পৌঁছে যায় এবং ব্যক্তি তা গিলে ফেলে, তবে ছিয়াম ভেঙে যাবে।

(১২) চোখের ড্রপ (Eye Drops):

বিবরণ: ছিয়াম অবস্থায় চোখের ঔষধ বা ড্রপ ব্যবহারের বিধান।

পর্যালোচনা: চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে চোখের সাথে নাক ও গলার একটি সংযোগকারী নালি (Tear Duct) রয়েছে। ফলে চোখে ড্রপ দিলে তা গলার ভেতরে পৌঁছানোর একটি পথ রয়েছে। এ কারণে সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশ ফক্বীহ এবং শায়খ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ ও শায়খ ইবনে উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে— চোখে ড্রপ দিলে ছিয়াম নষ্ট হয় না।

(১৩) নাকের ড্রপ (Nasal Drops):

বিবরণ: ছিয়াম অবস্থায় নাকের ভেতরে ঔষধের ড্রপ বা অন্য কোনো তরল ব্যবহারের বিধান।

পর্যালোচনা: অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে, নাকে ড্রপ ব্যবহার করলে ছিয়াম ভেঙে যায়। তাঁদের মতে, নাকে দেওয়া ড্রপ বা ঔষধ কণ্ঠনালি হয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছতে পারে, যা ছিয়াম ভঙ্গের কারণ হয়। শায়খ ইবনে উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন।

(১৪) স্বেচ্ছায় রক্তদান:

বিবরণ: বর্তমান যুগে মুমূর্ষু রোগীর প্রয়োজনে রক্তদান করা হয়। এর বিধান কী?

পর্যালোচনা: রক্তদানের বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকতর স্পষ্ট মতটি হলো— রক্তদানের বিষয়টি 'হিজামা' (শিঙা লাগানো) থেকে ভিন্ন। এর বিধান নির্ভর করে শরীর থেকে কতটুকু রক্ত নেওয়া হচ্ছে, তার পরিমাণের ওপর।

সুতরাং যখন দান করা রক্তের পরিমাণ অনেক বেশি হবে, তখন তা ছিয়াম ভঙ্গের কারণ হবে; আর যখন রক্তের পরিমাণ সামান্য হবে, তখন তা ছিয়াম ভঙ্গের কারণ হবে না।

(১৫) রক্ত পরীক্ষা (Blood Test):

বিবরণ: শারীরিক বিভিন্ন কারণে রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন পড়ে, এর বিধান কী?

পর্যালোচনা: রোগ নির্ণয়ের জন্য সামান্য রক্ত বের করলে ছিয়াম নষ্ট হয় না।

(১৬) গ্যাস্ট্রোস্কোপি (Gastroscopy) বা পাকস্থলী পর্যবেক্ষণ:

বিবরণ: গ্যাস্ট্রোস্কোপি হলো এমন একটি পর্যবেক্ষণ যন্ত্র, যা শরীরের ভেতরটা সরাসরি দেখার সুযোগ করে দেয়। এটি মূলত পরিপাকতন্ত্রের উপরের অংশ পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়।

পর্যালোচনা: মুখ দিয়ে যন্ত্র প্রবেশ করালে যদি তার সাথে কোনো তেল বা ঔষধ থাকে, তবে ছিয়াম ভেঙে যাবে। কিন্তু শুধু শুকনো যন্ত্র প্রবেশ করালে অধিকাংশের মতে ছিয়াম ভাঙবে না।

(১৭) জরায়ুর এন্ডোস্কোপি (Uterine Endoscopy):

বিবরণ: পরীক্ষার জন্য জরায়ুর ভেতরে ক্যামেরা বা এন্ডোস্কোপ প্রবেশ করানো হয়।

পর্যালোচনা: এতে ছিয়াম ভাঙবে না; এমনকি যন্ত্রের গায়ে লুব্রিকেন্ট থাকলেও সমস্যা নেই। কারণ জরায়ু বা প্রজনন অঙ্গের সাথে পাকস্থলীর সরাসরি কোনো পথ নেই।

(১৮) অ্যানেস্থেশিয়া বা অজ্ঞান করার গ্যাস ও ইনজেকশন:

বিবরণ: অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসার প্রয়োজনে রোগীকে অজ্ঞান করার জন্য নাক বা মুখ দিয়ে শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে বিশেষ গ্যাস (Inhaled Anesthesia) গ্রহণ করা অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরার (Intravenous) ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। এতে কি ছিয়াম থাকবে?

পর্যালোচনা: আন্তর্জাতিক ফিক্বহ অ্যাকাডেমির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অজ্ঞান করার গ্যাস গ্রহণ করলে ছিয়াম নষ্ট হয় না। কারণ এটি পানাহার নয় এবং এতে কোনো বস্তুগত কণা (Mass) নেই, যা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। মূলত অজ্ঞান করার গ্যাস ফুসফুসে যায় এবং শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে ক্রিয়া করে, যা ওযূ বা কুলি করার পর মুখে লেগে থাকা সামান্য পানির আর্দ্রতার মতো ক্ষমাযোগ্য।

তবে যদি অ্যানেস্থেশিয়ার কারণে ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত পুরো সময় অজ্ঞান থাকে, তাহলে জমহূর ফক্বীহ-এর মতে ছিয়াম হবে না এবং তাকে ক্বাযা আদায় করতে হবে। কারণ ছিয়ামের জন্য 'নিয়্যত' ও 'জ্ঞান' থাকা জরুরী। অবশ্য যদি দিনের কিছু অংশে অজ্ঞান থাকে, তাহলে ছিয়াম শুদ্ধ হবে।

আর যদি শরীরের নির্দিষ্ট অংশ অবশ করা হয়, তাহলে তাতে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।

(১৯) খাদ্যগুণসমৃদ্ধ ইনজেকশন:

বিবরণ: রোগীকে অনেক সময় খাদ্যগুণসমৃদ্ধ ইনজেকশন দিতে হয়, এটা যাবে কি?

পর্যালোচনা: গ্লুকোজ বা পুষ্টিবাহী ইনজেকশন, যা পানাহারের বিকল্প হিসেবে কাজ করে, তা গ্রহণ করলে ছিয়াম ভেঙে যাবে। এটি মূলত ছিয়ামের মূল উদ্দেশ্য পরিপন্থি।

(২০) ঔষধযুক্ত ইনজেকশন (Medicinal Injection):

বিবরণ: বিভিন্ন রোগে রোগীকে ইনজেকশন নিতে হয়, এর কারণে ছিয়াম ভাঙবে কি?

পর্যালোচনা: এসব ইনজেকশনে ছিয়াম নষ্ট হয় না। কারণ এটি পানাহার নয় এবং খাদ্যনালি দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে না।

(২১) ক্যাথেটার (Catheter):

বিবরণ: ক্যাথেটার হলো একটি বিশেষ ধরনের সরু নল, যা চিকিৎসার প্রয়োজনে শরীরের কোনো অঙ্গের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর অনেক ধরনের ব্যবহার থাকলেও, সাধারণ অর্থে ক্যাথেটার বলতে আমরা মূত্রথলির ক্যাথেটার বা ইউরিনারি ক্যাথেটারকেই (Urinary Catheter) বুঝে থাকি।

পর্যালোচনা: মূত্রনালিতে ক্যাথেটার বা ঔষধ প্রয়োগে ছিয়াম নষ্ট হয় না। মূত্রনালির সাথে পাকস্থলীর কোনো সরাসরি সংযোগ নেই।

(২২) ধমনী ক্যাথেটার (Arterial Catheterization):

বিবরণ: হৃদরোগ বা অন্য চিকিৎসার প্রয়োজনে ধমনীতে যে সরু নল (Catheter) প্রবেশ করানো হয়, তাতে ছিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে কি?

পর্যালোচনা: আন্তর্জাতিক ফিক্বহ অ্যাকাডেমির মতে, এটি ছিয়াম ভঙ্গ করে না। কারণ এই নলটি ধমনীতে প্রবেশ করানো হয়, যা সরাসরি পানাহার নয় এবং পানাহারের সমপর্যায়ভুক্তও নয়। এছাড়া এটি পাকস্থলীতেও প্রবেশ করে না।

(২৩) মলদ্বার বা যোনিপথে সাপোজিটরি (Suppository) ও ডুশ ব্যবহার:

বিবরণ: অর্শ রোগ বা অন্য চিকিৎসার জন্য মলদ্বার বা যোনিপথে সাপোজিটরি বা ডুশ (Enema) ব্যবহার করা হয়।

পর্যালোচনা: শায়খ ইবনে উছায়মীন রহিমাহুল্লাহ-এর মতে, এতে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না। এটি আধুনিক অধিকাংশ ফক্বীহ-এরও মত। কারণ মলদ্বার বা যোনিপথের সাথে পাকস্থলীর কোনো সরাসরি সংযোগ নেই। এছাড়া সাপোজিটরী কোনো খাদ্য বা পানীয় নয় এবং এটি শরীরকে পুষ্টি জোগায় না।

(২৪) যোনিপথের ধৌতকরণ (Vaginal Wash) ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি:

বিবরণ: নারীদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য যোনিপথে জীবাণুনাশক বা ঔষধযুক্ত তরল দিয়ে ধৌত করা (Vaginal Wash), অথবা জরায়ু ও যোনি পরীক্ষার জন্য ক্যামেরা (Endoscope) বা অন্য কোনো আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্র প্রবেশ করানোর বিধান কী?

পর্যালোচনা: এসকল প্রক্রিয়ার কোনোটির মাধ্যমেই ছিয়াম নষ্ট হয় না। এটি আধুনিক অধিকাংশ ফক্বীহ এবং আন্তর্জাতিক ফিক্বহ অ্যাকাডেমির (OIC Fiqh Academy) সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কারণ যোনিপথে যা প্রবেশ করানো হয়, তা পানাহার নয় এবং পানাহারের কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্যও এর দ্বারা পূরণ হয় না। তাছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথ্য অনুযায়ী, জরায়ু বা যোনিপথের সাথে পাকস্থলীর সরাসরি কোনো সংযোগ নেই।

(২৫) ত্বকে মলম, ক্রিম এবং ঔষধযুক্ত ব্যান্ডেজ ব্যবহার:

বিবরণ: ছিয়াম অবস্থায় চামড়ার ওপর বিভিন্ন প্রকার মলম, লোশন বা ঔষধযুক্ত ব্যান্ডেজ ব্যবহারের বিধান কী?

পর্যালোচনা: শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা রহিমাহুল্লাহ এবং আন্তর্জাতিক ফিক্বহ অ্যাকাডেমির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চামড়ায় যা কিছু লাগানো হয়, তাতে ছিয়াম নষ্ট হয় না। একইভাবে লেজার দিয়ে ত্বকের চিকিৎসাও বৈধ। কারণ চামড়া বা ত্বক পাকস্থলীতে কোনো কিছু পৌঁছানোর স্বাভাবিক প্রবেশপথ (Normal Inlet) নয়। ছিয়াম ভঙ্গের জন্য কোনো কিছু সরাসরি পাকস্থলীতে পৌঁছানো শর্ত।

(২৬) কিডনি ডায়ালাইসিস (Kidney Dialysis):

বিবরণ: কিডনি বিকল রোগীদের রক্ত পরিশোধনের জন্য ডায়ালাইসিস করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় ছিয়ামের বিধান কী?

পর্যালোচনা: শায়খ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ এবং সঊদী আরবের স্থায়ী ফতওয়া কমিটির মতে, ডায়ালাইসিস করলে ছিয়াম ভেঙে যাবে। ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়ায় শরীর থেকে রক্ত বের করে তা শোধন করা হয় এবং পুনরায় শরীরে প্রবেশ করানোর সময় তাতে প্রয়োজনীয় খনিজ ও পুষ্টি উপাদান যুক্ত করা হয়, যা মূলত খাদ্যের বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

(২৭) দন্ত চিকিৎসা (দাঁত তোলা, ফিলিং ও লেজার):

বিবরণ: ছিয়াম অবস্থায় দাঁত তোলা, ড্রিল করা বা লেজার দিয়ে মাড়ির চিকিৎসা করা যাবে কিনা?

পর্যালোচনা: দাঁত তোলা বা ফিলিং করা জায়েয এবং এতে ছিয়াম নষ্ট হয় না। তবে কোনো ঔষধ বা রক্ত যেন পেটে চলে না যায়—সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। যেহেতু এই কাজগুলো মুখ গহ্বরের ভেতরে সীমাবদ্ধ এবং এগুলো খাদ্য বা পানীয় নয়, ফলে তাতে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না।

(২৮) বায়োপসি (Biopsy) বা টিস্যু নমুনা (Tissue Sampling) সংগ্রহ:

বিবরণ: বায়োপসি বা টিস্যু নমুনা সংগ্রহ হলো, এমন একটি মেডিকেল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শরীরের কোনো অস্বাভাবিক এলাকা থেকে পরীক্ষার জন্য কোষ বা টিস্যুর নমুনা নেওয়া হয়। এটা করা যাবে কি?

পর্যালোচনা: আন্তর্জাতিক ফিক্বহ অ্যাকাডেমির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এটি ছিয়াম ভঙ্গ করে না। নমুনা সংগ্রহের এই প্রক্রিয়াটি পানাহার নয়। তবে শর্ত হলো, যন্ত্রের সাথে যেন কোনো তরল বা পুষ্টি উপাদান ভেতরে প্রবেশ না করে।

(২৯) ছিয়াম অবস্থায় ধূমপান:

বিবরণ: বিড়ি, সিগারেট বা হুক্কা সেবন করলে কি ছিয়াম ভেঙে যায়?

পর্যালোচনা: ধূমপান করলে ছিয়াম নিশ্চিতভাবে ভেঙে যায়। এটি আধুনিক ফক্বীহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কারণ সিগারেটের ধোঁয়া কেবল বাতাস নয়, এতে নিকোটিন ও সূক্ষ্ম কণা থাকে, যা খাদ্যনালি দিয়ে পেটে প্রবেশ করে এবং রক্তে মিশে শরীরের চাহিদা পূরণ করে।

(৩০) নিকোটিন প্যাচ:

বিবরণ: ধূমপান ছাড়ার জন্য চামড়ায় লাগানো প্যাচ, যা রক্তে নিকোটিন সরবরাহ করে।

পর্যালোচনা: এটি ছিয়াম ভঙ্গ করবে না।

ছিয়ামের ইতিহাস: তাক্বওয়া ও আত্মশুদ্ধি

-আবু আল-মিনান মো. আল-আমিন*

মুমিন বান্দাদের আল্লাহভীতি অর্জনের এক বে-মিছাল উপায়, আনন্দ-উল্লাস ও আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠার সেই মহতী ক্ষণ মাহে রামাযান। রামাযান রবের দরবারে উত্তম আমল পৌঁছানোর সর্বোত্তম মুহূর্ত, মালিকের প্রিয়ভাজন হওয়ার অসীম সম্ভাবনার হাতছানি, পাপরাশি থেকে মুক্ত হয়ে কলুষিত অন্তরকে স্বচ্ছ ও পবিত্র করার সুবর্ণ সুযোগ এবং রবের পক্ষ থেকে উম্মাহর জন্য হাদিয়াস্বরূপ। রামাযান সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জনের উপায়, যার পরতে পরতে নেকী লাভের অফুরন্ত পথ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত, দান-ছাদাক্বা, যিকির-আযকার, দু'আ যা-ই করা হোক না কেন, তার সম্মানে ছওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রামাযানের প্রতিটি রজনি যেন এক নেকীর জোয়ার নিয়ে আমাদের কাছে আসে, তার মধ্যে অন্যতম এক রজনি আছে, যা হাজার মাস থেকেও শ্রেয়। রামাযানে দিনের বেলা অল্প কিছু কাজ থেকে বিরত থাকা জান্নাতে প্রবেশের পথ করে দেয়। রামাযানের মহান ক্ষণে বান্দার জন্য শয়তানকে অবরুদ্ধ করা হয়। রামাযানের ছিয়ামের সেই প্রতিদান শুধু আল্লাহ স্বহস্তে প্রদান করবেন।

স্বাগত! মাহে রামাযান:

হে মুমিন ও মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! আমাদের শিরচ্ছায়ায় আগমন করেছে বরকত, রহমত ও মাগফিরাতের মহান মাস পবিত্র মাহে রামাযান। এই পবিত্র মাস আমাদেরকে নেকী অর্জনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। তাই আসুন! আমরা সবাই সাদরে ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই মাহে রামাযানকে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসি। ইবাদত-বন্দেগী, সংযম ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করি। এই মহাপবিত্র নেকী অর্জনের সুবর্ণ মৌসুমকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী মোহ থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যু-পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করি।

এই রামাযান আমাদের পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীদের মাঝেও ছিল। সুতরাং এই বিধান নিয়ে মনস্তাপ না করে এটাকে আনন্দের উপলক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করুন। ইসলামের ইতিহাসে ও কুরআনে কারীমের বর্ণনা অনুযায়ী, ছিয়াম কেবল উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরই নয়, বরং পূর্ববর্তী সকল নবী এবং তাদের উম্মতের উপরও ফরয ছিল। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হলো—যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হতে পার' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতের ছিয়াম সাধনা:

এ পর্যায়ে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতের ছিয়াম সাধনার বিষয়টি কেমন ছিল, তা নিয়ে তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাব, ইনশা-আল্লাহ!

ছিয়াম (الصيام) এর পরিচয়ে বলা যায়, এর শাব্দিক অর্থ হলো الْإِمْسَاكُ অর্থাৎ বিরত থাকা, উপবাস থাকা, দূরে থাকা, কথা বলা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থে বলা হয়, الْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، مَعَ النِّيَّةِ 'ছিয়াম হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়্যতের সাথে ছুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত অবধি খাদ্য, পানীয় এবং যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা'।[৩]

আমাদের পূর্বেও যে এই বিধান ছিল তার প্রমাণ হলো উল্লিখিত আয়াতটি। তাতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি যেমন আমাদের উপর এটি বাধ্যতামূলক করেছেন, তেমনি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও সেই হুকুম করেছিলেন। তাই আমাদের জন্য এই আয়াতে উদাহরণ রয়েছে এবং আমাদের উচিত আমাদের পূর্ববর্তীদের তুলনায় এই দায়িত্ব আরও সম্পূর্ণরূপে পালন করার চেষ্টা করা, যেমনটি পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন।

কারণ ছিয়াম আত্মাকে পবিত্র ও কলুষমুক্ত করে এবং খারাপ রসিকতা, নিকৃষ্ট চরিত্র ও অনৈতিকতা থেকে দূরে রাখে। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৩. আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ১/৫২৯।

www.al-itisam.com

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ‘হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কারণ বিবাহ দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন ছিয়াম রাখে। কারণ ছিয়াম তার জন্য ঢালস্বরূপ (যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী)।[৪]

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছিয়াম রাখার মাধ্যমে নিজের আত্মশুদ্ধি সম্ভব হয়। তাই তো রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করতে অসমর্থ যুবকের প্রতি ছিয়াম সাধনার আদেশ করেন। তাতে যেমন চক্ষু ও লজ্জাস্থানের হেফাযত হবে, তেমনি আত্মাকে পবিত্র করা সম্ভব হবে।

পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতের ছিয়াম:

আদম আলাইহিস সালাম -এর যুগ থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে বলে ধারণা করা হয়। আদম আলাইহিস সালাম নিজেও মাসে তিন দিন (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) ছিয়াম রাখতেন মর্মে ২/১টি ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায়।

ঠিক তেমনি দাঊদ আলাইহিস সালাম ও এক দিন ছিয়াম করতেন এবং এক দিন ভোজন করতেন, যা ছিয়ামে দাঊদ নামে পরিচিত এবং তার ছিয়াম পালনকে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় এবং সর্বোত্তম ছিয়াম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عليه السلام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছালাত হলো দাঊদ আলাইহিস সালাম -এর ছালাত এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিয়াম হলো দাঊদ আলাইহিস সালাম -এর ছিয়াম। তিনি অর্ধেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, তারপর রাতের এক-তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং রাতের শেষ-ষষ্ঠাংশ আবার ঘুমাতেন। আর তিনি এক দিন ছিয়াম রাখতেন এবং এক দিন ভোজন করতেন (অর্থাৎ ছিয়াম রাখতেন না)’।[৫]

অনুরূপভাবে মূসা আলাইহিস সালাম আশূরার দিন (১০ মুহাররম) ছিয়াম রাখতেন।

عن ابن عباس قال قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে দেখলেন যে, ইয়াহূদীরা আশূরার দিনে ছিয়াম রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘এটি কী?’ তারা বলল, এটি একটি মহান দিন, এই দিনে আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে নাজাত দিয়েছিলেন, তাই মূসা আলাইহিস সালাম এই দিনে ছিয়াম রেখেছেন। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমাদের চেয়ে মূসার অনুসরণে আমিই বেশি হক্বদার’। অতঃপর তিনি নিজে ছিয়াম রাখলেন এবং ছিয়াম রাখার নির্দেশ দিলেন।[৬]

একইভাবে মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথন এবং তাওরাত লাভের উদ্দেশ্যে তূর পাহাড়ে যে দীর্ঘ সময় (৪০ দিন) ইবাদতে মগ্ন ছিলেন, তূর পর্বতে ৪০ দিনের সফরে ছালাত আদায়ের পাশাপাশি দিনের বেলায় তিনি ছিয়াম রাখতেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ ‘আর আমি মূসার সাথে ৩০ রাতের ওয়াদা করেছি এবং আরও ১০ দ্বারা তা পূর্ণ করেছি। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময় ৪০ রাতে পূর্ণ হয়’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৪২)*।

তিনি এক মাস (যুলক্বা‘দাহ) ছিয়াম রাখার পর একটা ডাল দিয়ে মিসওয়াক করে ফেলেন; তাই পরে আরও ১০ (যুলহিজ্জাহ মাসের প্রথম ১০ দিন) দিন ছিয়াম পালনের আদেশ করা হয়, যার সমষ্টি হলো ৪০ দিন।[৭]

ইঞ্জীলের বর্ণনা অনুযায়ী, ঈসা আলাইহিস সালাম মরুভূমিতে ৪০ দিন ও ৪০ রাত ছিয়াম রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে খ্রিষ্টান ধর্মে ‘লেন্ট’ (Lent) নামক ছিয়াম রাখার একটি প্রথা প্রচলিত হয়, যা বর্তমানে ৪০ দিনের হয়ে থাকে।[৮]

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪০০।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/১১২৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/২০০৪।

৭. তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে কুরতুবী।

৮. মথি ৪:১-২।

www.al-itisam.com

পূর্ববর্তী উম্মতের ছিয়াম ও বর্তমান ছিয়ামের পার্থক্য:

পূর্ববর্তী উম্মতের ছিয়াম ও বর্তমান ছিয়ামের মধ্যে মৌলিকভাবে দুটি পার্থক্য বলা যেতে পারে—

(ক) সাহারী: পূর্ববর্তী উম্মত সাহারী খেতেন না। ঘুমানোর পর রাত গভীর হলে তাদের পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যেত। আমাদের জন্য সাহারী খাওয়া সুন্নাত এবং এটি একটি বরকতময় কাজ। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً.

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা সাহারী খাও। কেননা সে সাহারীতে বরকত নিহিত আছে’।[৯]

(খ) সময়কাল: কোনো কোনো উম্মতের জন্য একটানা ৪০ দিন বা তার বেশি ছিয়াম রাখার বিধান ছিল। আমাদের জন্য টানা এক মাস (রামাযান) ছিয়াম রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ‘রামাযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং হেদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে ছিয়াম পালন করে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*।

উপসংহার:

ছিয়ামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সকল যুগেই এক ছিল আর তা হলো ‘তাক্বওয়া’ বা আল্লাহভীতি অর্জন করা। তাই আসন্ন রামাযান হোক তাক্বওয়া অর্জন ও রবের সান্নিধ্য লাভের এক অনন্য উপায়। এই রামাযান হোক নেকী অর্জনের এক সুবর্ণ সুযোগ, পাপরাশি থেকে মুক্তির এক উত্তম সময়। যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে, সেই তো সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। আর রহমতের এই ইলাহী ক্ষণে যে নিজেকে নিষ্পাপ করতে পারবে না, সে তো চরম হতভাগা। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই ব্যাপারে সতর্ক করেছেন—

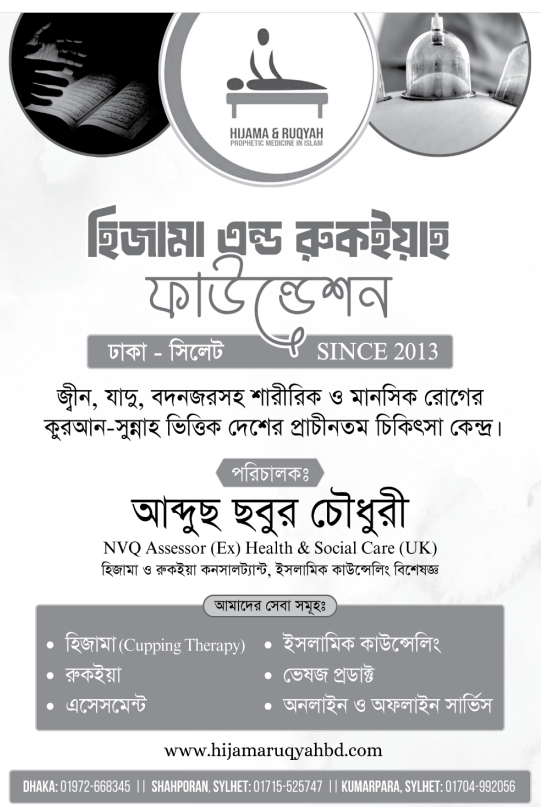
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ.

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘ধ্বংস হোক (অপমানিত হোক) সেই ব্যক্তি! যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হলো; অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করল না। ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তি! যে রামাযান মাস পেল, অতঃপর রামাযান শেষ হয়ে গেল; কিন্তু তার গুনাহ ক্ষমা করা হলো না। আর ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তি! যে তার পিতামাতাকে বার্ধক্যে পেল; অথচ তারা তাকে (তাদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না’।[১০]

রব্বে কারীমের দরবারে আমরা অন্তরভরে ও প্রাণপণ ফরিয়াদ জানাই, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সকল উত্তম ও সৎকর্ম করার তাওফীক্ব দান করুন। আমাদের দ্বারা সম্পাদিত প্রত্যেকটি নেক আমল নিজ অনুগ্রহে কবুল করুন এবং আমাদের জানা-অজানায় সংঘটিত সকল গুনাহ ও অপকর্ম ক্ষমা করে দিন। আপনার রহমত ও দয়ায় আমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করুন- আমীন!

৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৯২৩।

১০. তিরমিযী, হা/৩৫৪৫।



ছিয়ামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

-সাইফুল্লাহ আল-মামুন মাদানী*

আরবী শব্দ ‘ছওম’-এর বহুবচন হলো ছিয়াম, যার অর্থ اَلْإِمْسَاكُ বা বিরত থাকা। মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল ধরনের খাবার, পানীয় ও জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখার নাম ছওম। মানুষ এক আল্লাহর গোলাম। আর মহান আল্লাহ মানুষের একমাত্র উপাস্য ও মালিক। গোলামের সাথে তার মালিকের দূরত্ব কমানো এবং নৈকট্য বৃদ্ধির সর্বোত্তম মাধ্যম হলো এই ছওম। ছওম গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। ফারসী ভাষায় যা রোযা এবং বাংলায় উপবাসব্রত হিসেবে পরিচিত। তবে শারঈ শব্দ ছওম দিয়ে যা বুঝানো হয়, রোযা বা উপবাস দিয়ে অনেকাংশেই তা বুঝায় না। খাদ্য, পানীয় ও জৈবিক চাহিদা বর্জনের পাশাপাশি মানুষের যেসব কথা, কাজ ও আচার-আচরণ মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না সেগুলো থেকে বিরত থাকাও ছওমের পূর্ণতার শর্ত।

ছওমের ইতিহাস অতি প্রাচীন। যুগে যুগে পূর্ববর্তী অনেক জাতি ও গোষ্ঠী আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে এই ছওম পালন করেছে *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*। সে ধারাবাহিকতায় উম্মতে মুহাম্মাদীও ছওম পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ছওমের মাস রামাযানের জন্য। ইবাদত হিসেবে অবশ্য পালনীয় অর্থাৎ ফরয ছওম আছে, আবার ঐচ্ছিক তথা নফল ছওমও আছে। ছওম কখনো ফরয, আবার কখনো নফল। আরবী নবম মাস রামাযানুল মুবারক ফরয ছওম পালনের নির্ধারিত মাস *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*।

রামাযানের এক মাস বিরতিহীনভাবে ছওম পালন করা ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ।[১২] এছাড়া রামাযানের বাইরেও ছওম পালন করা হয়, যা নফল হিসেবে পরিচিত। ব্যক্তির আত্মশুদ্ধিতে, পরিবারের শৃঙ্খলায়, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায়, রাষ্ট্রের অন্যান্য অভাবী মানুষের ক্ষুধার কষ্ট উপলব্ধি করার উপায় হিসেবে এবং অর্থনৈতিক ইনছাফ ও সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় ছওমের ভূমিকা অপরিসীম। আখেরাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সংগ্রাম, ধৈর্য, সংযম ও সহমর্মিতার গুণ জরুরী। ছওম হচ্ছে এ সকল গুণের উৎসস্থল। ছওম বান্দাকে আত্মশুদ্ধি ও তাক্বওয়া অর্জন করতে সাহায্য করে, রবের নৈকট্য লাভের দুয়ার খুলে দেয় এবং বান্দার মনোরাজ্যে প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার হিম্মত তৈরি করে। ছওম কেবল মুমিনকে পানাহার থেকে বিরত রাখে না, বরং যাবতীয় পাপ ও অন্যায় কাজ থেকেও বিরত রাখে, চরিত্র গঠন করে এবং চরিত্র শোধন করে। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। আমাদের জীবনে ছওম কেন এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য প্রবন্ধে তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব—

(১) ছওম ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ: মহান আল্লাহর নিকট ছওম অতি গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্ম। আর সে জন্যই ইসলাম যে প্রধান পাঁচটি স্তম্ভের উপরে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, তার চতুর্থ স্তম্ভটিই এই ছওম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ- وصَومِ رمضانَ ‘ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত’। একথা বলে রাসূল ﷺ বলেন, ‘আর রামাযানের ছওম’।[১৩]

তাছাড়া হাদীছে কুদসীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّه لِي، وَأَنَا أَجْزِي به ‘তবে ছওম ব্যতীত, কেননা তা আমার জন্য রাখা হয় আর এর পুরস্কার আমি নিজেই দিব’।[১৪]

(২) আল্লাহভীতি অর্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছওম: পরকালে যে দুটি জিনিস সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে, তার একটি হচ্ছে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি।[১৫] সেই আল্লাহভীতি অর্জনের সবচেয়ে বেশি কার্যকরী প্রক্রিয়া হচ্ছে ছওম। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ﴾ ‘তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হতে পার’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

(৩) আমল হিসেবে ছওমের বিকল্প হয় না: আমলে ছালেহ বা সৎকর্ম বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তার মধ্যে যে সৎকর্মটির কোনো তুলনা হয় না, তা হচ্ছে ছওম। রাসূল ﷺ তাঁর এক প্রিয় ছাহাবী উমামা আল-বাহেলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে ছওম পালনে উৎসাহ দিয়ে বলেন, عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ ‘হে আবূ উমামা! তুমি বেশি বেশি ছওম পালন করো। কেননা ছওম এমন একটি ইবাদত, যার মতো আর কিছু নেই’।[১৬]

(৪) ছওমের পুরস্কার অসীম: ধৈর্য ও ক্ষমার মতো কিছু সৎকর্ম রয়েছে, যার প্রতিদান বা পুরস্কারের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ছওম তেমনি একটি সৎকর্ম, যার পুরস্কার আল্লাহ নিজে দিবেন এবং বেহিসাবী সেই পুরস্কার দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেছেন, إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّه لِي، وَأَنَا أَجْزِي به ‘তবে ছওম ব্যতীত, কেননা তা আমার জন্য রাখা হয় আর এর পুরস্কার আমি নিজেই দিব’।[১৭]

(৫) ছওমে লৌকিকতা বা রিয়া নেই: রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত আল্লাহ কখনো কবুল করেন না। রিয়া এক রকমের

* সাবেক দাঈ, ইসলামিক সেন্টার, আবহা, সঊদী আরব; পরিচালক, আস-সুন্নাহ একাডেমী, তাফালবাড়ী, শরণখোলা, বাগেরহাট।

১২. ছহীহ মুসলিম, হা/১৬।

১৩. ছহীহ বুখারী, হা/৮।

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৯২।

১৫. আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/২৮৯, হাদীছটি ছহীহ।

১৬. নাসাঈ, হা/২২২২, হাদীছটি ছহীহ।

১৭. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৯২।

শিরক।[১৮] ছওম ছাড়া সকল ইবাদতের মধ্যেই রিয়ার একটা সহজ সুযোগ থাকে, যা ছওমের মধ্যে নেই বললেই চলে। হাদীছে কুদসীতে বলা হয়েছে, يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِن أَجْلِي 'সে আমার জন্যই তার খাবার ও প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করেছে'।[১৯]

(৬) ছওম হলো ছিয়াম পালনকারীর সুপারিশকারী: পরকালে কঠিন বিচারের মাঠে মহান আল্লাহর অনুমতিতে সুপারিশের সুযোগ থাকবে *(আল-বাক্বারা, ২/২৫৫)*। নবীগণ ও নেককারগণ তাদের রবের অনুমতি সাপেক্ষে যখন কিছু মানুষের বেলায় সুপারিশ করবেন, তখন কিছু কিছু ইবাদত তার ইবাদতকারীর পক্ষে সুপারিশ করতে দাঁড়িয়ে যাবে। ছওম হচ্ছে তাদের অন্যতম। রাসূল ﷺ বলেছেন, الصيامُ والقرآنُ يَشْفَعانِ للعبدِ، يقولُ الصيامُ : أَيْ رَبِّ! إني مَنَعْتُهُ الطعامَ والشهواتِ بالنهارِ، فشَفِّعْني فيه 'কুরআন ও ছওম বান্দার জন্য সুপারিশকারী হবে। ছওম বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে দিনের বেলায় খাবার-পানীয় ও দৈহিক চাহিদা পূরণ থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার পক্ষে আমাকে সুপারিশের অনুমতি দিন'।[২০]

(৭) প্রবৃত্তি দমনে অনন্য: অসৎ প্রবৃত্তিই আদম সন্তানের বড় শত্রু। প্রতিটি মানুষকে রীতিমতো তার অসৎ প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করেই জান্নাতের পথে এগোতে হয়। প্রবৃত্তির লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে কত মানুষ জাহান্নামী হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কেউ চায় না যে তার ঠিকানা জাহান্নামে হোক। প্রবৃত্তির তাড়না দমন ছাড়া জান্নাতের আশা কেবলই মরীচিকা। ছওম হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক এক ব্যবস্থাপত্র, যা ব্যক্তির প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। রাসূল ﷺ বলেছেন, ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ؛ فإنَّه له وِجَاءٌ 'যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন ছওম পালন করে। কেননা ছওম তার প্রবৃত্তি দমিয়ে রাখবে'।[২১]

(৮) জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির সেরা মাধ্যম: পরকালে জান্নাত মঞ্জুর এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে পারা মুমিনের জীবনের সর্বোচ্চ চাওয়া এবং এটিই জীবনের প্রকৃত সফলতা। রাসূল ﷺ বলেছেন,

إنَّ في الجنةِ بابًا يقالُ له: الريَّانُ يقالُ يومَ القيامةِ: أين الصَّائمون؟ هل لكم إلى الريَّانِ؟ من دخلَهُ لم يظمأْ أبدًا فإذا دخلوا أغلِقَ عليهم فلم يدخلْ فيه أحدٌ غيرُهم.

'জান্নাতে রাইয়ান নামে একটি দরজা রয়েছে। ছওম পালনকারীকে সেই দরজা থেকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য আহ্বান করা হবে। তখন সেখান থেকে কেবল ছওম পালনকারীরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, অন্য কেউ নয়। আর সেখানে তারা চিরকালের জন্য পিপাসামুক্ত থাকবে'।[২২]

(৯) সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে: স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। সুস্বাস্থ্য আল্লাহর দেওয়া এক নেয়ামত। ছিয়াম ব্যক্তির স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে। চিকিৎসা বিজ্ঞান শুধু ধর্মীয় বিধান হিসেবেই নয়, বরং সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে মাঝেমধ্যেই ছওম পালনে উৎসাহিত করেছে। এ জন্যই হয়তো মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রিয় ছাহাবীদেরকে মাসে তিনটি ছওম পালনের পরামর্শ দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মাসে অন্তত তিনটি ছওম পালন করতে পরামর্শ দিয়েছেন'।[২৩]

(১০) ছওম ক্ষুধার্ত গরীবের কষ্ট অনুভব করায়: কষ্টকর পরিস্থিতিতে না পড়া পর্যন্ত সচ্ছল লোকজন ক্ষুধার যন্ত্রণা যে কী কঠিন, তা উপলব্ধিই করতে পারে না। ধনী-গরীব সকল মুমিনের উপরেই ছওম ফরয হওয়ার সুবাদে রামাযানের এক মাসে প্রত্যেক সম্পদশালী মুসলিমই অভাবের কষ্টটা উপলব্ধি করতে পারে। এর মাধ্যমে নির্দয়ের অন্তরও দয়ার্দ্র হয়। আর যারা অসহায় মানুষের বেলায় দয়াপরবশ হয়, আরশের মালিক দয়াময় আল্লাহও তাদের প্রতি রহম করেন। গরীবের কষ্ট অনুভব ছাড়া গরীবের প্রতি দয়ার মানসিকতা তৈরি করা সম্ভব নয়। ছওমের মধ্য দিয়ে মুমিন যখন ক্ষুধার জ্বালা বুঝে, তখন তার মাঝে গরীবের কষ্ট বুঝার মানসিকতা তৈরি হয় এবং সে তাদের প্রতি দয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে, যা তাকে রহমনের দয়া পেতে সাহায্য করে।

(১১) গুনাহ মাফের অসীলা: ছওম মানুষকে একদিকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে, অন্যদিকে কৃত গুনাহ মাফেরও সুযোগ করে দেয়। বিশেষত গোটা মাহে রামাযানই গুনাহ মাফের এক সুবর্ণ ক্ষণ। ছওমের অসীলাতে মাহে রামাযানের প্রতিটি রাতেই অগণিত বান্দাকে গুনাহ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন, مَن صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, ছওয়াবের আশায় ছওম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[২৪]

(১২) ধৈর্য ও সংযমের শিক্ষা দেয়: ধৈর্য আর সংযম সফলতার মূল চাবিকাঠি। ছিয়াম পালনের মাধ্যমে একরকম অবচেতনভাবেই তা অর্জিত হয়ে যায়। প্রতিদিন কোনো ব্যক্তি যখন ছিয়ামের মধ্য দিয়ে ধৈর্য ও সংযম চর্চা করে, তখন তা তাকে ধৈর্যশীল ও সংযমী করে তোলে। এটা তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক দারুণ সুফল বয়ে আনে। ছওম ব্যক্তিকে মিছে, অপ্রয়োজনীয় ও মূর্খতাপূর্ণ আচরণ বর্জনে বাধ্য করে। রাসূল ﷺ বলেন, من لم يدَعْ قولَ الزُّورِ والعملَ بِهِ فليسَ للَّهِ حاجةٌ بأن يدَعَ طعامَهُ وشرابَهُ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা আর মিথ্যা কর্ম ছাড়তে পারল না, সে ব্যক্তির খাবার-পানীয় বর্জন করে ছওম পালনের কোনো প্রয়োজন নেই'।[২৫]

আসুন! আমরা ছওমের গুরুত্ব অনুধাবন করি, মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রামাযানে ফরয ছওম এবং অন্যান্য মাসে বেশি বেশি নফল ছওম পালন করি। একদিনের একটি নফল ছওমের দ্বারা ছওম পালনকারী ব্যক্তি ও জাহান্নামের মধ্যে সত্তর বছরের দূরত্ব তৈরি হয়। ছওমের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন- আমীন!

১৮. ইবনু মাজাহ, হা/৪২০৪ হাদীছটি ছহীহ।
১৯. ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৯২।
২০. মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৬২৬, হাদীছটি ছহীহ।
২১. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৬৫।
২২. নাসাঈ, হা/২২৩৬, হাদীছটি ছহীহ।
২৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৮১।
২৪. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৪।
২৫. তিরমিযী, হা/৭০৭।

শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাস রামাযান

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

দুনিয়াতেই বিভিন্ন গুনাহের যে কাফফারার বিধান দেওয়া হয়েছে, তার সারমর্ম করলে দেখা যায় যে, ইসলামে দুটি মাধ্যমে গুনাহের কাফফারা হয়ে থাকে— একটি টাকার মাধ্যমে, আরেকটি ছিয়ামের মাধ্যমে। যেমন- যিহার (الظِّهَار)-এর কাফফারা হলো স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে দাস মুক্ত করা। আমরা সবাই জানি, দাস মুক্ত করতে টাকা লাগে। যদি কেউ অর্থনৈতিক কারণে দাস মুক্ত করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাকে টানা দুই মাস ছিয়াম পালন করতে হবে *(আল-মুজাদালাহ, ৫৮/৩–৪)*।

ঠিক তেমনি কসম ভঙ্গের কাফফারা হলো— (ক) ১০ জন মিসকীনকে মাঝারি মানের খাবার খাওয়ানো, (খ) ১০ জনকে কাপড় দেওয়া এবং (গ) দাস মুক্ত করা।

এগুলোর কোনোটাই অর্থনৈতিক কারণে করতে না পারলে তিন দিন ছিয়াম পালন করতে হবে *(আল-মায়েদা, ৫/৮৯)*। অনুরূপই হজ্জে হাদি দিতে না পারলে কাফফারা হচ্ছে— হজ্জের মধ্যে তিন দিন ছিয়াম আর বাড়িতে ফিরে সাত দিন ছিয়াম *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৬)*।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত উদাহরণে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর যেকোনো গুনাহ অত্যধিক দান অথবা অত্যধিক ছিয়ামের মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়া সম্ভব। গুনাহ মেটানোর জন্য মহান আল্লাহর নির্ধারিত যে পদ্ধতি রয়েছে, সেই পদ্ধতিতে ছিয়াম অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ছিয়ামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সীমাহীন।

পৃথিবীর কোনো কিছুই প্রশিক্ষণ ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। আমরা অনেকেই বিভিন্ন গুনাহ ও আসক্তিতে লিপ্ত থাকি। এগুলো থেকে বের হওয়ার বিভিন্ন উপায় খুঁজি। ইসলামে মানুষের বিধি-বিধান মানার ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে শয়তান ও নফসের সাথে যুদ্ধ করার মাধ্যমে। আর এই যুদ্ধে টিকে থাকতে হলে অন্তরের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা খুব জরুরী। আমাদের দ্বারা যত গুনাহ ও আসক্তি হয়, তার মূল কারণই হচ্ছে আমাদের নফসের উপর আমাদের কোনো ক্ষমতা না থাকার কারণে। আমাদের নফস শয়তানের গোলাম আর আমরা নফসের গোলাম। তাই সকল ধরনের সমস্যা থেকে বের হতে সর্বপ্রথম নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। নফসকে শয়তানের গোলাম থেকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করা উচিত। আর কখনোই এই কাজটি ঘরে বসে আরামে করা সম্ভব নয়, বরং কাজ করা এবং পরিশ্রম করার মাধ্যমেই এটি অর্জিত হবে। আর সেই কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জরুরী কাজ হলো ছালাত। নফসকে মৃত্যু পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের উপর অটল রাখতে পারলে নফস মৃত্যু পর্যন্তই আল্লাহর গোলাম থাকবে। একেক ওয়াক্ত ছালাত শয়তানের বিরুদ্ধে একেকটি যুদ্ধ। ছালাতের পরে দ্বিতীয় যে ইবাদত নফসের উপর বান্দার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে তা হচ্ছে ছিয়াম, বিশেষ করে রামাযানের ছিয়াম। রামাযানের ছিয়াম মাসব্যাপী একটি ফুল কোর্সের মতো। একটানা ৩০ দিন যদি আমরা আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে মহান আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখতে পারি, তাহলে আমাদের নিজেদের নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ অনেক মযবূতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যা পরবর্তীতে আমাদের জন্য দ্বীন পালন করা সহজ করে তুলবে।

মারইয়াম (আ.) যখন নির্জন এলাকা থেকে তার সন্তান ঈসা আলাইহিস সালাম-সহ লোকালয়ে প্রবেশ করলেন, তখন মানুষজন তাকে তার সন্তান বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ ‘আমি মহান রবের উদ্দেশ্যে ছিয়ামের মানত করেছি। তাই আজকে কোনো মানুষের সাথে কথা বলতে পারব না’ *(মারইয়াম, ১৯/২৬)*। এই আয়াতে ছিয়াম দ্বারা মারইয়াম (আ.) কথা বলা থেকে বিরত থাকাকে বুঝিয়েছেন তথা তিনি মানুষের প্রশ্নের কোনো উত্তর দিবেন না এবং যা উত্তর দেওয়ার, তার ছেলে ঈসা আলাইহিস সালাম উত্তর দিবে। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ছিয়াম শুধু খাবার থেকে বিরত থাকার নাম নয়; বরং সব ধরনের বিরত থাকার ক্ষেত্রে ছিয়াম শব্দটি আরবী ভাষায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

ছিয়াম পালনের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে শুধু লজ্জাস্থান ও পেটকে তার প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখা। এই স্তর পালন করলে ফারযিয়্যাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু অতিরিক্ত ফযীলত নির্ভর করবে দ্বিতীয় স্তরের উপর আর সেটাই ছিয়ামের প্রকৃত স্তর,

যার মাধ্যমে ছিয়ামের সকল ধরনের ফযীলত পাওয়া যায়। সেই স্তরে পৌঁছতে হলে পেট ও লজ্জাস্থানের পাশাপাশি শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে হবে। মারইয়াম (আ.) যেমন তার জিহ্বা বা মুখের ছিয়াম রেখেছেন, ঠিক তেমনি আমাদেরকেও রামাযান মাসে জিহ্বাকে অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। আমাদের চোখকে অশ্লীল দৃশ্য থেকে আর কানকে অশ্লীল আওয়াজ তথা গান-বাজনা থেকে বিরত রাখতে হবে। আর ছিয়ামের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে শুধু বিরত থাকা নয়, বরং গুনাহ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আল্লাহর আনুগত্যে কাজে লাগানো। যেমন- জিহ্বাকে অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখার পাশাপাশি মহান আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত রাখা।

মহান আল্লাহ আমাদের রামাযানকে সর্বোত্তম অবস্থায় কাটানোর তাওফীক্ব দান করুন! যাবতীয় গুনাহ থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি রাতের ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, দান-ছাদাক্বা, ই‘তিকাফ ও লায়লাতুল ক্বদরে রাত্রি জাগরণসহ বিভিন্ন নেক আমলে পরিপূর্ণ রেখে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় পালন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

ছিয়াম পালনকারীর জন্য দশটি নছীহত

মূল: ড. আব্দুর রাযযাক আল-বাদর হাফিযাহুল্লাহ
পরিমার্জিত অনুবাদ: তাওহীদুর রহমান সালাফী*

রামাযান মাসের একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে ছিয়াম সাধনা। আমরা ছিয়াম পালন করি তার মানে এটা নয় যে, এমনিতেই পরিপূর্ণ প্রতিদান পেয়ে যাব, বরং এর জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বিষয়ের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ ‘কত ছিয়াম পালনকারী আছে, যাদের ছিয়ামের বিনিময়ে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই জোটে না। কত ছালাত আদায়কারী আছে, যাদের রাত জাগরণ ছাড়া আর কিছুই জোটে না’।[২৮]

উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছিয়াম পালনের সাথে আরও কিছু বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ ছিয়াম পালনকারীদের তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন।[২৯] আমরা যদি আমাদের ছিয়ামকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রাপ্তির মাধ্যম করতে চাই, তাহলে নিম্নলিখিত ১০টি নছীহতের উপর আমল করার চেষ্টা করব, ইনশা-আল্লাহ!

১. ছিয়ামসহ সকল ইবাদতে নিয়্যতকে একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ রাখা (إِخْلَاصُ النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ وَكُلِّ الْعِبَادَاتِ) : প্রত্যেক ইবাদতে নিজের নিয়্যত বিশুদ্ধ রাখা, বিশেষ করে ছিয়াম পালনে। ইবাদতে নিয়্যত বিশুদ্ধ করা খুব কঠিন কাজ। যেমন- ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, مَا عَالَجْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نِيَّتِي إِنَّهَا تَقَلَّبُ عَلَيَّ অর্থাৎ ‘আমার নিয়্যতকে ঠিক করার চেয়ে বেশি কঠিন কোনো কিছু পাইনি, আমার কাছে সেটা বারবার পরিবর্তন হতে থাকে’।[৩০]

ছিয়াম রাখা অবস্থায় লোকের সামনে নিজের ছিয়ামকে নিয়ে প্রশংসা করা উচিত নয়। যেমন- আমি ছিয়াম পালন করছি তো বেশি ভালো লাগছে, সারা বছর ছিয়াম থাকলে আমার জন্য আরও ভালো ইত্যাদি।

২. অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করা তথা যিকিরে মশগূল থাকা (الإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ): ছিয়াম অবস্থায় অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করা। যে কোনো ইবাদতে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করলে সেই ইবাদতের মর্যাদা অধিক বেড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবাদতকারীর মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশি উত্তম, যে তার ঈবাদতে অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে। সুতরাং সর্বোত্তম ছিয়াম পালনকারী সেই ব্যক্তি, যে অধিকহারে অনুরূপভাবে অন্যান্য ইবাদতেও আল্লাহকে স্মরণ করে।[৩১]

৩. ছিয়ামকে গুনাহ ও হারাম কাজ থেকে হেফাযত করা (حِفْظُ الصِّيَامِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالذُّنُوبِ): ছিয়ামকে হারাম জিনিস থেকে সুরক্ষিত রাখা। যেমন- মিথ্যা কথা বলা, ধোঁকা দেওয়া, গালমন্দ করা, পরনিন্দা করা ইত্যাদি। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই’।[৩২]

অন্যত্র নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ". قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ . فَقَالَ " إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ‘তোমরা কি বলতে পার, নিঃস্ব লোক কে?’ তারা বললেন, আমাদের মাঝে যার দিরহাম (টাকা-পয়সা) ও ধন-সম্পদ নেই, সেই তো নিঃস্ব লোক। তখন তিনি বললেন, ‘আমার উম্মতের মধ্যে সেই প্রকৃত নিঃস্ব লোক, যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছওম ও যাকাত নিয়ে আসবে; অথচ সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ ভোগ করেছে, অমুককে হত্যা করেছে এবং অমুককে প্রহার করেছে। এরপর সে ব্যক্তিকে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, অমুককে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর যদি পাওনাদারের অধিকার তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না যায়, তাহলে সে ঋণের পরিবর্তে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।[৩৩]

শুধু পানাহার না করেই পরিপূর্ণ ছিয়াম পালন করা যায় না, বরং তার সাথে অন্যান্য হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ইবনু রজব আল-হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: أَهْوَنُ الصِّيَامِ: تَرْكُ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ অর্থাৎ ‘কতিপয় সালাফ বলেছেন যে, সবচেয়ে সহজতর ছিয়াম হচ্ছে পানাহার পরিহার করা’।[৩৪]

৪. ফরয ইবাদতসমূহ, বিশেষত সময়মতো ছালাত আদায় করা (الْحِفَاظُ عَلَى الْفَرَائِضِ، خَاصَّةً الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا): ছিয়াম অবস্থায় ফরয বিধানগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা, বিশেষত পাঁচ

---

* ফারেগ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, উত্তরপ্রদেশ, ভারত; শিক্ষক, সরল পথ একাডেমি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

২৮. ইবনু মাজাহ, হা/১৬৯০, হাদীছটি ছহীহ।
২৯. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/২৩৪।
৩০. খতীব আল-বাগদাদী, আল-জামে‘ লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি, ২/২৮৮।
৩১. আল-ওয়াবিলুস সায়্যিব, ১/৭৫।
৩২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৩।
৩৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪৭৩।
৩৪. লাতায়েফুল মাআরিফ, পৃ. ১৫৫।

ওয়াক্ত ছালাতের প্রতি। আর সম্ভব হলে মসজিদে বসে বসে এক ছালাতের পর আরেক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। সেটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে আযানের কিছুক্ষণ আগে বা জামাআতের আগে এসে অপেক্ষা করা।

৫. কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা (الْعِنَايَةُ بِالْقُرْآنِ): কুরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়াতে হবে। যেহেতু রামাযান মাস কুরআনের কারণেই ফযীলতপূর্ণ। অতএব, এই মাসে বিশেষ করে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাড়ানো উচিত। তেলাওয়াত করে হোক অথবা অর্থসহ পড়ে হোক, আমাদেরকে কুরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়াতে হবে। কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ {الم} حَرْفٌ، وَلَكِنْ {أَلِفٌ} حَرْفٌ، وَ{لَامٌ} حَرْفٌ، وَ{مِيمٌ} حَرْفٌ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে, তার জন্য এর কারণে একটি ছওয়াব আছে। আর ছওয়াবটি তার ১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ’।[৩৫] হাদীছে এসেছে,كَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ‘রামাযান মাসে প্রত্যেক রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম দেখা করতেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন’।[৩৬]

ইবনু রজব আল-হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ কতিপয় সালাফের ব্যাপারে বলেন যে, কেউ কেউ তিন দিনে কুরআন পড়ে শেষ করতেন, কেউ সাত দিনে, আবার কেউ দশ দিনে। এছাড়াও ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ-এর ব্যাপারে বলেন যে, রামাযান মাস আগমন করলে তিনি হাদীছ ও অন্যান্য দারস ছেড়ে কুরআনের দিকে মনোনিবেশ করতেন।[৩৭]

উল্লেখ্য, তিন দিনের কমে কুরআন শেষ করার যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেটা ফযীলতপূর্ণ সময় ও ফযীলতপূর্ণ জায়গার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।[৩৮]

৬. রামাযানের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো এবং সময় নষ্ট না করা (اغْتِنَامُ الْوَقْتِ وَعَدَمُ تَضْيِيعِهِ فِي رَمَضَانَ): বিশেষ করে রামাযান মাসে প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে এবং সময় নষ্ট করা হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ এর জন্য আল্লাহ তাআলা হিসাব নিবেন। নবী ﷺ বলেছেন, لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ؟ ‘ক্বিয়ামতের দিন বান্দার পা দুখানা সরবে না (আল্লাহর দরবার থেকে তাকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না), যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে তার আয়ু সম্পর্কে, সে তা কীসে ব্যয় করেছে?’[৩৯]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, إِضَاعَةُ الْوَقْتِ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ إِضَاعَةَ الْوَقْتِ تَقْطَعُكَ عَنِ اللهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ، وَالْمَوْتُ يَقْطَعُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا ‘সময় নষ্ট করা মৃত্যুর চেয়ে কঠিন ব্যাপার। কারণ সময় নষ্ট করলে আল্লাহ ও পরকাল থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয় আর মৃত্যু দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী থেকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে’।[৪০]

৭. ঈমান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ছিয়াম ও ক্বিয়াম করা (أَنْ يَكُونَ الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا): রবের নিকট নেকীর উদ্দেশ্যেই ছিয়াম পালন করা উচিত। ছিয়ামের ফযীলতের প্রতি বিশ্বাস রেখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করতে হবে তা পালন করতে হবে।

৮. দান-ছাদাক্বা করা এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা (الْعِنَايَةُ بِالْعَطَاءِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ): রামাযান মাস বিশেষভাবে দান-খয়রাতের মাস। অতএব, এই মাসে নিজ সাধ্যমতো অধিক পরিমাণে দান-ছাদাক্বা করা উচিত। হাদীছে এসেছে, لَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম দেখা করতেন, তখন তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হতেন’।[৪১]

৯. ছিয়ামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা (الْحِرْصُ عَلَى التَّفَقُّهِ فِي أَحْكَامِ الصِّيَامِ): ইবাদতের পদ্ধতি যদি শুদ্ধ না হয়, তাহলে সেটা রবের নিকট গৃহীত হবে না। তাই যেকোনো ইবাদতের পূর্বে সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা জরুরী, অনুরূপভাবে রামাযান মাসের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা উচিত।

১০. দু‘আর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং অধিকহারে দু‘আ করা (الْعِنَايَةُ بِالدُّعَاءِ وَالْإِكْثَارُ مِنْهُ): মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ‘আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, নিশ্চয় আমি তো নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায়, তারা সঠিক পথে চলবে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৬)*। নবী ﷺ বলেছেন, ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ‘তিন ব্যক্তির দু‘আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না— ১. সন্তানের জন্য পিতার দু‘আ, ২. ছায়েমের দু‘আ এবং ৩. মুসাফিরের দু‘আ’।[৪২]

পরিশেষে মহান রবের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের ছিয়াম-ক্বিয়ামসহ অন্যান্য ইবাদত যথাযথভাবে আদায় করার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

৩৫. তিরমিযী, হা/২৯১০, হাসান।
৩৬. ছহীহ বুখারী, হা/৩২২০।
৩৭. লাতায়েফুল মাআরিফ, পৃ. ৩১৮।
৩৮. লাতায়েফুল মাআরিফ, পৃ. ৩১৯।
৩৯. তিরমিযী, হা/২৪১৭, হাদীছটি ছহীহ।
৪০. আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ৪৪।
৪১. ছহীহ বুখারী, হা/৩২২০।
৪২. বায়হাক্বী, হা/৬৩৯২; ছহীহুল জামে‘, হা/৩০৩২।

রামাযানে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস*

ভূমিকা:

রামাযান হলো সেই মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়। শুধু তাই নয়, বরং প্রতিটি আসমানী কিতাবই রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল।[৪৪] জিবরীল আলাইহিস সালাম রামাযানের প্রতি রাতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তারা পরস্পরকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন।[৪৫] এ দিক থেকে রামাযান মাস মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অনন্য নেয়ামত। এ মাস কেবল ছিয়াম, ইফতার বা তারাবীহর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং রামাযান মাস হলো কুরআন নাযিলের মাস। মহান আল্লাহ কুরআন নাযিলের জন্যই এ মাসকে নির্বাচন করেছেন। তাই রামাযানে কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক হওয়া চাই আরও গভীর, আরও নিবিড়। কিন্তু দুঃখজনক যে, আজ মানুষ কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। ফলে মানুষ শুধু রামাযান মাসেই কুরআন খতম দিয়ে থাকে এবং বাকি পুরো বছর তা ছেড়ে রাখে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমাদের আলোচনা তাদের জন্য সামান্য হলেও উপকার বয়ে আনবে, ইনশা-আল্লাহ!

রামাযান ও কুরআনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক:

রামাযান মাসেই লাওহে মাহফূয থেকে দুনিয়ার আসমানে কুরআন একেবারে নাযিল করা হয়, এরপর দীর্ঘ ২৩ বছরে পর্যায়ক্রমে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়। এ কারণেই সালাফে ছালেহীন রামাযানে কুরআনের সাথে সম্পর্ককে অন্য সব মাসের তুলনায় বহুগুণ বাড়িয়ে দিতেন। ইমাম যুহরী রহিমাহুল্লাহ বলতেন, إِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ‘রামাযান আসলে কুরআন তেলাওয়াত ও খাদ্যদানের মাস’।[৪৬]

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রামাযানের কুরআন তেলাওয়াত:

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বছরই কুরআনের সাথে যুক্ত থাকতেন, তবে রামাযানে তাঁর তেলাওয়াত আরও বৃদ্ধি পেত। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عليه السلام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

‘নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনসম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রামাযানে জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সাথে দেখা করতেন, তখন তিনি আরও অধিক দান করতেন। রামাযানের প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি রহমতপ্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধনসম্পদ দান করতেন’।[৪৭] রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই আমল প্রমাণ করে যে, রামাযানে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সুন্নাহ।

কুরআন তেলাওয়াতের সাধারণ ফযীলত:

(১) প্রতিটি হরফে ১০টি ছওয়াব: কুরআন তেলাওয়াত করা একটি ইবাদত। প্রতিটি হরফের জন্য রয়েছে বিরাট ছওয়াব। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফ তেলাওয়াত করবে, তার জন্য একটি নেকী। আর প্রতিটি নেকী ১০ গুণ বৃদ্ধি করা হয়’।[৪৮] রামাযানে যেহেতু নেকীর প্রতিদান আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়, তাই কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াবও হয় অসীম।

(২) কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি ফেরেশতাদের সাথে থাকবে: আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ ‘কুরআনে দক্ষ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সম্মানিত পুণ্যবান ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবেন। যে ব্যক্তি কুরআন আটকে আটকে তেলাওয়াত করে এবং তা তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য দুটি ছওয়াব রয়েছে’।[৪৯]

(৩) মসজিদে বসে কুরআন পড়লে আয়াত পরিমাণ উট অপেক্ষা উত্তম: উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ،

---

* বিএ, অনার্স, হাদীছ বিভাগ, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৪৪. ত্বাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর, হা/১৮৫, হাদীছটি হাসান।

৪৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬২৪, ৬২৮৫, ৬২৮৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৫০; মিশকাত, হা/৬১৩৮।

৪৬. ইবনু উছায়মীন, মাজমূআ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল, ২০/২২২।

৪৭. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩০৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/১৮৮৯; মিশকাত, হা/২০৯৮।

৪৮. তিরমিযী, হা/২৯১০; দারেমী, হা/৩৩১১; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৩২৭; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৪১৬; মিশকাত, হা/২১৩৭।

৪৯. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৯৮।

www.al-itisam.com

وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ ‘তোমাদের কেউ কি এরূপ করতে পার না যে, সকালে মসজিদে গিয়ে মহান আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত জানবে অথবা পড়বে, এটার তার জন্য দুটি উষ্ট্রীর তুলনায় উত্তম। আর তিনটি আয়াত তিনটি উষ্ট্রী থেকে উত্তম। চারটি আয়াত চারটি উষ্ট্রী থেকে উত্তম। এর চেয়ে অধিক সংখ্যক আয়াত অনুরূপ অধিক সংখ্যক উট থেকে উত্তম’।[৫০]

রামাযানে কুরআন তেলাওয়াতের বিশেষ ফযীলত:

(১) ছিয়ামের সাথে সাথে কুরআনও সুপারিশ করবে: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. فَيُشَفَّعَانِ ‘ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানাপিনা ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা হতে বিরত রেখেছিলাম। অতএব, তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব, তার ব্যাপারে আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে’।[৫১] উক্ত হাদীছে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াতের দলীল পাওয়া গেল। আর বেশি বেশি কুরআন পড়লে কুরআন সুপারিশ করবে সেটাও স্পষ্ট জানা গেল।

(২) প্রত্যেকটি নেক কাজের ছওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ: রামাযান মাসে প্রত্যেকটি ভালো আমলের জন্য ১০ থেকে ৭০০ গুণ ছওয়াব দেওয়া হয়। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللهُ ‘আদম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক আমলের ছওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়’।[৫২] রামাযান মাসে এত ছওয়াব, অথচ রামাযানের বাইরে ছিল প্রতিটি হরফে ১০টি নেকী। এ হাদীছ থেকে রামাযান মাসে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়।

(৩) কুরআন তেলাওয়াতকারী সর্বোত্তম ব্যক্তি: যে ব্যক্তি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পড়বে, তার মর্যাদাও মহান। উছমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়’।[৫৩]

কী পরিমাণ সম্মান রয়েছে কুরআন তেলাওয়াত এবং কুরআন শিক্ষাদানের মধ্যে তা বলে বুঝানো যাবে না। আমাদের উচিত এই পবিত্র রামাযান মাসে ছিয়াম পালনের পাশাপাশি অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং তা শিক্ষা দেওয়া।

(৪) কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য প্রাপ্তি মহান প্রতিদান: কুরআন পাঠকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে মহা প্রতিদান রয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত আজরে আযীম তথা মহা প্রতিদানের আশায় কুরআন তেলাওয়াত করা। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا ‘ক্বিয়ামতের দিন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন পাঠ করতে থাকো এবং উপরে উঠতে থাকো, দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে ধীরে পাঠ করতে সেভাবে পাঠ করতে থাকো। যে আয়াতে তোমার পাঠ শেষ হবে, সেখানেই তোমার থাকার জায়গা’।[৫৪]

(৫) কুরআন তেলাওয়াতের সাথে জড়িয়ে থাকলে আল্লাহর রহমত ও ভালোবাসা পাওয়া যায়: আমাদের চেষ্টা করতে হবে মসজিদ-মাদরাসা ও দ্বীনী হালাকা ও কুরআন-সুন্নাহর মাহফিলগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে। কুরআন তেলাওয়াত, কুরআনের মর্ম ও বিধি-বিধান শিক্ষার উদ্দেশ্যে সমবেত হতে চেষ্টা করতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ‘যখন কোনো দল আল্লাহর কোনো ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে এবং জ্ঞানচর্চা করে, তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদের ঢেকে নেয় এবং মালায়িকা তথা ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে। আর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নিকট গর্বের সাথে তাদের কথা উল্লেখ করেন’।[৫৫]

হৃদয়ের পরিশুদ্ধতা:

রামাযান আত্মশুদ্ধির মাস। কুরআন তেলাওয়াত মানুষের অন্তরকে জীবিত করে, তাক্বওয়া বৃদ্ধি করে এবং গুনাহ থেকে দূরে রাখে।

বাকি অংশ ১৯ নং পেজে...

৫০. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৩; মিশকাত, হা/২১১০।
৫১. বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/১৮৩৯; আহমাদ, হা/৬৬২৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হা/৫০৮১; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৯৮৪, ১৪২৯; মিশকাত, হা/১৯৬৩।
৫২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫১।
৫৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭; মিশকাত, হা/২১০৯।
৫৪. আবূ দাঊদ, হা/১৪৬৪; তিরমিযী, হা/২৯১৪; মিশকাত, হা/২১৩৪, হাদীছটি ছহীহ।
৫৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯; আবূ দাঊদ, হা/১৪৫৫; ইবনু মাজাহ, হা/২২৫; দারেমী, হা/৩৬৮; মিশকাত, হা/২০৪।

ই‘তিকাফ প্রসঙ্গ

মূল: ড. আব্দুল আযীম আল-বাদাবী
অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন*

রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করা সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমল। এটি কল্যাণ লাভের আশায় ও লায়লাতুল ক্বদর পাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

‘আমরা একে নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে। আপনি কি জানেন, ক্বদরের রাত্রি কী? ক্বদরের রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে অবতরণ করেন ফেরেশতাগণ এবং রূহ, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে। এ রাতে কেবলই শান্তি বর্ষণ হয়, যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/১-৫)*।

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

‘আল্লাহর রাসূল ﷺ রামাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতেন এবং বলতেন, তোমরা রামাযানের শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করো’।[৫৭]

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ‘তোমরা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করো’।[৫৮]

রাসূল ﷺ লায়লাতুল ক্বদরে ক্বিয়ামের প্রতি উৎসাহ দিতেন এবং তা পালনে আগ্রহ সৃষ্টি করতেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘যে ব্যক্তি লায়লাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় ছালাতে রত থাকবে, তার বিগত সকল (ছগীরা) গুনাহ ক্ষমা করা হবে’।[৫৯]

ই‘তিকাফ শুধু মসজিদেই করা শরী‘আতসিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ‘তোমরা মসজিদসমূহে ই‘তিকাফরত অবস্থায় তাদের (স্ত্রীদের) প্রতি সংগত হয়ো না’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ই‘তিকাফ মসজিদেই হতো।

ই‘তিকাফরত ব্যক্তির জন্য সুন্নাত হলো, তিনি নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত রাখবেন। যেমন- ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর, ইস্তিগফার, নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ, দু‘আ, দ্বীনি আলোচনা ও জ্ঞানার্জন।

ই‘তিকাফকারীর জন্য অপছন্দনীয় হলো, সে এমন কথা বা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে, যা তার জন্য উপকারী নয়। আবার তার জন্য এ কথাও অপছন্দনীয় যে, সে মনে করবে—‘কম কথা বলা’ই যেন আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার বিশেষ উপায়—এই ধারণায় নীরব থেকে যাবে।[৬০]

জরুরী প্রয়োজনে ই‘তিকাফের স্থান (মসজিদ) থেকে বাইরে বের হওয়া, যেমন- প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া, ওযূ বা গোসলে যাওয়া, খাবার বা ঔষধ আনা ইত্যাদি। চুল আচড়ানো, মাথা মুণ্ডানো, নখ কাটা, শরীর পরিষ্কার করা- এসবও ই‘তিকাফকারীর জন্য বৈধ।

তবে ই‘তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে যদি তিনি অপ্রয়োজনে মসজিদ থেকে বাইরে যান অথবা তিনি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেন।

রামাযানে কুরআন তেলাওয়াতের বাকি অংশ

লায়লাতুল ক্বদরের প্রস্তুতি:

লায়লাতুল ক্বদর কুরআন নাযিলের রাত। যে ব্যক্তি রামাযান জুড়ে কুরআনের সাথে যুক্ত থাকে, সে এই রাতের বরকত গ্রহণ করতে বেশি সক্ষম হয়।

উপসংহার:

রামাযান কেবল একটি মাস নয়, বরং এটি কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ। যে ব্যক্তি রামাযানে কুরআনকে আপন করে নেয়, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই আলোকিত করে দেন। তাই আসুন, আমরা এই রামাযানে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ককে শুধু তেলাওয়াতেই নয়, বরং আমল ও চরিত্রে কুরআনকে ধারণ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

* প্রিন্সিপ্যাল, দারুস সালাম ইসলামী কমপ্লেক্স, পিরুজালী ময়তাপাড়া, গাযীপুর।

৫৭. ছহীহ বুখারী, হা/২০২০; ছহীহ মুসলিম, হা/১০২৬।
৫৮. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৯।
৫৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০১,২০১৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬০।
৬০. ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৪/৪০৪ (সংক্ষেপিত)।

লায়লাতুল ক্বদর: সুযোগ হারাবার আগেই জেগে উঠুন!

-হুসাইন আহমাদ আল-ইয়াদী*

ভূমিকা: মহাকালের আবর্তে প্রতিবছর আমাদের জীবনে এমন একটি রাত আসে, যা অন্ধকার ছাপিয়ে মুমিনের হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেয় পরম প্রাপ্তির প্রদীপ। সেই রাতটি কোনো সাধারণ রাত নয়, বরং তা হচ্ছে 'লায়লাতুল ক্বদর' নামক এক মহিমান। নীল আকাশের কার্নিশ বেয়ে আকাশের সীমানা পেরিয়ে ক্বদরের রাত যখন পৃথিবীর বুকে পরম মমতা নিয়ে নেমে আসে, তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এক অপার্থিব প্রশান্তি আর ফেরেশতাদের রহমতের শীতল পরশ। এটি সেই রজনি, যা মানবজাতির মুক্তির সনদ 'আল-কুরআন' নাযিলের মাধ্যমে ধরণিকে করেছে ধন্য। এই একটি রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি আমাদের জন্য এক বিশেষ উপহার, এক স্বর্গীয় বোনাস। কিন্তু ঠিক কোন রাতে লুকিয়ে আছে এই অমূল্য রত্ন? কেনই-বা একে পেতে নবী ﷺ শেষ ১০ দিনের প্রতিটি বিজোড় রাতে হন্যে হয়ে খুঁজতেন? আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আর পাপমুক্তির এক নতুন অধ্যায় রচনার জন্য আসুন আজ আমরা জেনে নিই এই মহিমান্বিত রাতের গুরুত্ব এবং আমাদের করণীয়।

লায়লাতুল ক্বদরের অনন্য মহিমা ও ফযীলতসমূহ:

১. কুরআন নাযিলের রাত: আল্লাহ তাআলা এই রাতেই মানবজাতির হেদায়াতের মশাল কুরআনে কারীম অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ 'নিশ্চয়ই আমি এটি (কুরআন) ক্বদরের রাতে নাযিল করেছি' *(আল-ক্বদর, ৯৭/১)*। কুরআনের পরশ যে পেয়েছে, তাকেই সে করেছে মহিমান্বিত। যে ফেরেশতা কুরআন এনেছেন তিনি হয়েছেন শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা, যার উপর নাযিল হয়েছে, তিনি হয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আর যে মাসে এটি এসেছে, তা হয়েছে শ্রেষ্ঠ মাস। ঠিক তেমনি যে রাতে এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, কুরআনের সেই অনন্য সম্মানেই 'লায়লাতুল ক্বদর' হয়েছে হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এক রজনি। অর্থাৎ কুরআনের পরশই এই রাতকে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে মর্যাদাবান ও বরকতময় করেছে।

২. ভাগ্য নির্ধারণের রাত: এই রাতে আল্লাহ তাআলা আগামী এক বছরের জন্য সৃষ্টিজগতের যাবতীয় তাক্বদীর বা ফয়সালা নির্ধারণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ 'এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়, আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে' *(আদ-দুখান, ৪৪/৪)*। এই রাতে আগামী এক বছরের হায়াত-মউত, সচ্ছলতা-অভাব, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য এবং সম্মান-অসম্মানসহ যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أن يخلقَ السَّمواتِ والأرضَ بخمسينَ ألفَ سنةٍ 'আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই সৃষ্টিজগতের ভাগ্যলিপি লিখে রেখেছেন'।[৬২] তাহলে লায়লাতুল ক্বদরে পুনরায় ভাগ্য নির্ধারণের অর্থ কী?

আসলে এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। মানুষের চিরন্তন ভাগ্যলিপি মূল ডাটাবেজ বা 'লাওহে মাহফূযে' সৃষ্টির শুরুতেই সংরক্ষিত হয়েছে। আর লায়লাতুল ক্বদরের রাতে সেই মূল লিপি থেকে আগামী এক বছরের জন্য নির্দিষ্ট অংশটুকু (রিযিক্ব, হায়াত, মৃত্যু ইত্যাদি) ফেরেশতাদের নথিতে স্থানান্তর করা হয়।[৬৩]

৩. বরকতময় রজনি: ক্বদরের রাতটি অত্যন্ত বরকতময় ও কল্যাণময়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ 'নিশ্চয়ই আমি এটি (কুরআন) এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি' *(আদ-দুখান, ৪৪/৩)*।

৪. হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদত: এই রাতের ইবাদত অন্য যেকোনো সময়ের ১ হাজার মাস (যা প্রায় ৮৩ বছর ৪ মাস) ইবাদতের চেয়েও উত্তম। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ 'লায়লাতুল ক্বদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম' *(আল-ক্বদর, ৯৭/৩)*। অর্থাৎ এমন ১ হাজার মাস, যাতে ক্বদরের রাত নেই, তার চেয়েও এই একটি রাতের ইবাদত আল্লাহর কাছে অনেক বেশি মূল্যবান।

অধিকাংশ মুফাসসির ও ছালেহ আল-উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর অশেষ অনুগ্রহ ও দয়ার কারণে এই রাতটিকে এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে, এতে কৃত ইবাদত ও নেক আমলের ছওয়াব হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। অর্থাৎ যদি কোনো মানুষ হাজার মাস ধরে নেক আমল করে, যার মধ্যে লায়লাতুল ক্বদর নেই; তবুও লায়লাতুল ক্বদরে কৃত একটি নেক আমল তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কারণ এই রাতে রয়েছে অপরিসীম ছওয়াব, মহান প্রতিদান, কল্যাণ ও বরকত। আবার কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, আরবরা অনেক সময় বড় কোনো সংখ্যা বা অগণিত পরিমাণ বুঝাতে 'হাজার' শব্দটি ব্যবহার করত। আল্লাহ তাআলা এখানে মুমিনদের উৎসাহিত করতে এই আধিক্যের পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন।[৬৪]

৫. ফেরেশতাদের পদচারণা ও রহমত অবতরণ: এই রাতে জিবরীল আলাইহিস সালাম ও অগণিত ফেরেশতা যমীনে নেমে আসেন।

* শিক্ষার্থী, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৬২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৩।
৬৩. তাফসীরে সা'দী, সূরা ক্বদরের তাফসীর দ্রষ্টব্য।
৬৪. তাফসীরে কুরতুবী; https://binothaimeen.net/s/GFQqwlVd

www.al-itisam.com

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ ‘সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরীল আলাইহিস সালাম) তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রত্যেক কল্যাণময় বিষয় নিয়ে অবতীর্ণ হন’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/৪)*।

৬. প্রশান্তি ও নিরাপত্তার রাত: এই রাতটি আদ্যোপান্ত শান্তিময়। অনিষ্টতা ও পাপাচার থেকে মুক্ত থেকে মুমিনরা সারা রাত ইবাদতে মগ্ন থাকেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ ‘এই রাতটি পুরোপুরি শান্তিময়, ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/৫)*।

৭. এ রাতে শয়তান বের হয় না: রাসূল ﷺ বলেছেন, لَا يَحِلُّ لِلشَّيطَانِ أَنْ يَخرُجَ معها يومئذ ‘সেদিন শয়তানের জন্য তার সাথে বের হওয়া অনুমোদিত হয় না’।[৬৫]

লায়লাতুল ক্বদর কখন পালন করবে?

রামাযান মাসের শেষের ১০ দিনের বেজোড় রাতগুলোতেই লায়লাতুল ক্বদর হয়ে থাকে, রাসূল ﷺ বলেছেন, تَحَرَّوْهَا فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ‘তোমরা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে তা (লায়লাতুল ক্বদর) অনুসন্ধান করো’।[৬৬]

লায়লাতুল ক্বদরের আমলসমূহ:

১. ছালাত আদায় করা: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, من قام ليلةَ القدْرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه ‘যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে এবং ছওয়াবের আশায় লায়লাতুল ক্বদরে ছালাত আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে’।[৬৭]

২. অন্য সময়ের তুলনায় অধিক ইবাদত করা: আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযানের শেষ দশকে এমনভাবে ইবাদতে পরিশ্রম করতেন, যা অন্য সময় করতেন না’।[৬৮] তাই আমাদের শত ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর জন্য সময় বের করে অন্য সময়ের থেকে বেশি ইবাদত করা উচিত।

৩. নিজের সাথে স্ত্রী-পরিবারকেও জাগানো: আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ‘নবী ﷺ যখন (রামাযানের) শেষ দশকে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি কোমরের কাপড় শক্ত করে বেঁধে নিতেন, সারা রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকতেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে (ইবাদতের জন্য) জাগিয়ে দিতেন’।[৬৯]

৪. ই‘তিকাফ করা: হাদীছে এসেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, أَنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِن رَمَضَانَ ‘নিশ্চয়ই নবী ﷺ রামাযানের শেষ ১০ দিন ই‘তিকাফ করতেন’।[৭০] লায়লাতুল ক্বদর দ্বারা শুধু রামাযানের শেষ ১০ দিনের বেজোড় রাতগুলো উদ্দেশ্য। তাই কেউ যদি ই‘তিকাফ করে, তাহলে সে অবশ্যই লায়লাতুল ক্বদরও পেয়ে যাবে।

৫. বিশেষ একটি দু‘আ পাঠ করা: আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, তুমি বলবে, اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা‘ফু আন্নী। অর্থ: ‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাস। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও’।[৭১]

সতর্কীকরণ: তবে এই মহিমান্বিত রাতকে কেন্দ্র করে রাত্রি জাগরণের নাম দিয়ে সমাজে বিভিন্ন রীতি ও প্রথা প্রচলিত রয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে শরীআত বিরোধী। যেমন- (ক) কবরস্থানে গিয়ে সম্মিলিত দু‘আ করা। (খ) আতশবাজি ও আনন্দ-উল্লাস করা। এই পবিত্র রাতকে উৎসবের রাত মনে করে আতশবাজি ফোটানো বা পটকা ফোটানো। (গ) নির্দিষ্ট তারিখ নিশ্চিত করে উদযাপন করা। (ঘ) বিশেষ ছালাত উদ্ভাবন করা, যেমন- ১২ রাকআত, ১০০ রাকআত ইত্যাদি। (ঙ) কেবল জেগে থাকা, ইবাদত না করা। যেমন- গল্প, আড্ডা, গেমস, মোবাইলে উদ্দেশ্যহীন স্ক্রল করা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি। (চ) মৃতদের রূহ বাড়িতে আসে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করা। (ছ) মীলাদের আয়োজন করা ইত্যাদি।

উপসংহার:

সুযোগ হারাবার আগেই জেগে উঠো হে উম্মত! লায়লাতুল ক্বদর হলো আমাদের ঝরঝরে হয়ে যাওয়া জীবনকে নতুন করে সাজানোর এক স্বর্গীয় সুযোগ। হাজার মাসের ইবাদতের ছওয়াব যদি একটি রাতেই পাওয়া যায়, তবে সেই রাত কি হেলায় হারিয়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে? হয়তো আপনার একটি রাতের আন্তরিক ইবাদত আর দুফোঁটা চোখের অশ্রুই বদলে দিতে পারে আপনার আগামী বছরের পুরো রূপরেখা। তাই আসুন, এই শ্রেষ্ঠ রজনিতে ঘুমের মোহ ত্যাগ করে আমরা আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিই। জীবনের সব ক্লান্তি আর পাপ মুছে নেওয়ার এই মহাসুযোগ বারবার আসে না। নিজে জেগে উঠুন, জাগিয়ে তুলুন নিজের আত্মাকে এবং লুফে নিন লায়লাতুল ক্বদরের এই বিশেষ উপহার। মহান আল্লাহ আমাদের লায়লাতুল ক্বদরকে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা আর ভাবগাম্ভীর্য সহকারে পালন করার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

৬৫. ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩৬৮৮, হাদীছটি শাহেদের ভিত্তিতে হাসান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
৬৬. ছহীহ বুখারী, হা/২০১৭।
৬৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬৯।
৬৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭৫।
৬৯. ছহীহ বুখারী, হা/২০২৪।
৭০. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২।
৭১. তিরমিযী, হা/৩৫১৩।

ছোটদের ছিয়াম

-রাকিব আলী*

ছিয়াম ইসলামের ফরয একটি বিধান। ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ছিয়াম ভঙ্গ করলে কাফফারা হিসেবে একটানা ৬০টি ছিয়াম রাখতে হয়। এখান থেকে বোঝা যায়, ছিয়াম রাখার কত গুরুত্ব এবং ভেঙে দেওয়ার কত বড় দুনিয়াবি শাস্তি। এজন্য ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ছিয়াম রাখার সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর এ বিধানের সাথে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এখন ছোট মানুষ, আস্তে আস্তে আরও বড় হয়ে ছিয়াম রাখবে এই ভাবনা মাথায় এনে উদাসীন থাকলে চলবে না।

ছোট ছোট বাচ্চারা ছিয়াম রাখতে চাইলে তাদের নিষেধ করা উচিত নয়। কারণ ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম তাঁদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের ছিয়াম রাখাতেন, মসজিদে নিয়ে যেতেন এবং তাদের জন্য তুলা, পশম ইত্যাদির খেলনা বানিয়ে দিতেন। ছিয়াম অবস্থায় (দিনের বেলা) ক্ষুধায় কান্না করলে, তাঁরা শিশুদের খেলনা দিতেন। ওরা খেলনা পেয়ে খেলত আর খাবারের কথা ভুলে যেত। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।[৭৩]

বালেগ হওয়ার পর থেকে একজন মানুষের উপর ছিয়াম ফরয হয়ে যায়, যা সাধারণত ১০-১১ বছর বয়সের মধ্যে হয়ে যায়। এখন ৬-৭ বছর বয়স থেকে প্র্যাকটিস করা শুরু না করলে হঠাৎ করে ১০ বছর বয়সে ৩০টি ছিয়াম রাখা তাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়বে। এজন্য আগে থেকে বাচ্চাদের ছিয়াম রাখার প্র্যাকটিস করতে দিতে হবে। তা না হলে তাদের প্রতি একধরনের যুলুম করা হবে। কীভাবে? কেননা আগে থেকে ছিয়াম রাখার অভ্যাস না করলে তারা যখন হঠাৎ করে ফরয হওয়ার পর একসাথে ছিয়াম রাখতে পারবে না কিংবা রাখতে অনেক কষ্ট হবে, তখন বোঝা যাবে- আগে থেকে ছিয়াম রাখার প্র্যাকটিস করতে না দেওয়াটা তাদের প্রতি এক প্রকার যুলুমই ছিল, যা এতদিন অভিভাবকদের মায়ার চাদরে ঢাকা ছিল।

ছোট ছোট বাচ্চাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক সময় ছিয়াম রাখতে দেই না। জীবনের প্রথম ছিয়াম রাখার জন্য খুব এক্সাইটেড থাকে। ছিয়াম রাখার জন্য সাহরী মিস করলে মা-র সাথে সে কী অভিমান যে, তাকে কেন উঠানো হলো না, কেন ছিয়াম রাখার সুযোগ দেওয়া হলো না। আর তারাও ছিয়াম রাখতে না পেরে মন খারাপ করে বসে। এজন্য ছিয়াম রাখার প্রতি তাদের যে আগ্রহ, সেটাতে পানি ঢেলে দেওয়া উচিত নয়।

তবে এটা ঠিক যে, ছোট মানুষ হওয়ায় ছিয়াম রাখলে খাবার খেতে না পারায় প্রথম প্রথম তাদের ক্ষুধার কষ্ট হতে পারে। এতে সন্তানের প্রতি অনেক মায়া হবে, যা খুব স্বাভাবিক। তবে এই মায়ায় আল্লাহর ফরয বিধানে তাকে অভ্যস্ত করানোর যে দায়িত্ব আপনার আছে, সেটার প্রতি যেন আপনাকে উদাসীন করে না তুলে—সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে প্রথম প্রথম তাদেরকে অর্ধ দিন না খেয়ে থাকার চ্যালেঞ্জ দেওয়া যেতে পারে। এতে তারা আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। সারাদিন না খেলে শরীর খারাপ করার নাম করে ছিয়াম রাখতে না দেওয়ার মাধ্যমে বেশি আহ্লাদ দেখানো ভালো না। এমন আহ্লাদের ফল মোটেও ভালো কিছু বয়ে আনবে না। মনে রাখবেন, ছোটকাল থেকে অভ্যস্ত না করালে পরে তাদের ছিয়াম রাখানো সহজ হবে না। তখন ছিয়াম ছেড়ে দেওয়াকে তারা গুরুতর মনে করবে না।

ছোট বাচ্চাদের প্রথম ছিয়াম রাখা নিয়ে একটা আইডিয়া শেয়ার করি। আমাদের পরিবারের যে ছোটমণি তার জীবনের প্রথম ছিয়াম রেখেছে, তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা তাকে কোনো উপহার দিতে পারি, যা তার জন্য অনেক স্পেশাল হবে। আর সেটা হতে পারে ক্রেস্ট। একজন মুমিন কাউকে উপহার দিতে গেলেও তার সেই উপহারকে ঘিরে দ্বীনি চিন্তা থাকবে, দ্বীনি স্বার্থ থাকবে। সেই জায়গা থেকে উপহার দেওয়ার এই সুযোগে আমরা ক্রেস্টে তার জীবনে প্রথম ছিয়াম রাখার তারিখ ও সময়কাল উল্লেখসহ সংক্ষেপে দ্বীনি নছীহত-সম্বলিত এমন কিছু কথা লিখে দিতে পারি, যা তাকে দ্বীনের পথে চলার নির্দেশ দিবে, যা তাকে দ্বীনের পথে চলার কথা মনে করিয়ে দিবে।

উপহার পেয়ে সে অনেক খুশি হবে, উৎসাহ পাবে। এছাড়া, তার জীবনের প্রথম ছিয়াম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কয়েক বছর পর সে যখন এই উপহার হাতে নিয়ে দেখবে, তখন তার স্মৃতির মানসপটে অনেক কিছু ভেসে উঠবে। দ্বীনের ঐ নছীহত তার জন্য রিমাইন্ডার হিসেবে কাজ দিবে। হতে পারে ঐ নছীহত তাকে দ্বীনের পথে চলার গুরুত্ব নিয়ে ভাবাবে, দ্বীন থেকে পথচ্যুত হয়ে থাকলে দ্বীনের পথে ফিরাবে ইনশা-আল্লাহ।

* আম্বরখানা, সিলেট।

৭৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬০।

রামাযানের শিক্ষা সারা বছরের পাথেয়

-অনুবাদ: আব্দুল মোমিন তাজেমুল হক*

হে মুসলিম! রামাযান মাস শেষ হয়েছে। এটি ছিল ইবাদতকারীদের মাস। রামাযান মাস চলে গেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে, সে ব্যক্তির জানা উচিত, আল্লাহ জীবিত, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। ছিয়ামের মাস, ক্বিয়ামের মাস, কুরআন তেলাওয়াতের মাস শেষ হয়েছে। ভালো কাজের মাস, দানের মাস ও সদ্ব্যবহারের মাস শেষ হয়েছে। যে ব্যক্তি লাভবান হওয়ার মতো কাজ করেছে, সে লাভবান হয়েছে আর যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো কাজ করেছে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

হে মুসলিম! এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাস ও সময়গুলোর মধ্যে রামাযান মাসকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং এ মাসের ভালো কাজগুলোর প্রতিদান দ্বিগুণ করেছেন। এ মাসটিকে বিভিন্ন রহমত ও বরকত দ্বারা বিশেষায়িত করেছেন। এ মাসে বান্দার জন্য ইবাদত করা সহজ করেছেন। এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করেছেন, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দিয়েছেন এবং বিতাড়িত জিন ও শয়তানকে বন্দি করেছেন।

ঐ ব্যক্তির জন্য তোমার অন্তর কি চিন্তিত হয় না? তোমার নফস কি কষ্ট পায় না? তুমি দেখবে কতক মানুষ যারা ছিয়াম পালন করছিল, ছালাত আদায় করছিল, এমনকি ক্বিয়ামুল লায়ল আদায় করছিল, যাকাত প্রদান করছিল, দান-ছাদাক্বা করছিল এবং এই মহান মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে ভালো কাজ করার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছিল। এখন তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা সমস্ত ভালো কাজগুলো থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, মসজিদগুলোকে তারা পরিত্যাগ করবে, জামাআতে লোকসংখ্যা কমে যাবে, ছালাত ছেড়ে দিবে, দান-ছাদাক্বা করার ব্যাপারে কৃপণ হয়ে যাবে, ভালো কাজের পরে আবার মন্দ কাজে ফিরে যাবে, বাকি মাসগুলোকে তারা হত্যা করে ফেলবে। তাদের দেখে মনে হবে যেন তারা অন্য কোনো রবের ইবাদত করছিল অথবা তারা শুধু রামাযান মাসকে আল্লাহর ইবাদতের মাস মনে করে।

হে মুসলিম! যদিও রামাযান শেষ হয়েছে, কিন্তু মুসলিমদের জন্য অন্য মাসগুলোও রামাযানের মতোই। তার জন্য নেকী রয়েছে। এ থেকে বিমুখ হওয়া বা আমল পরিত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। ছালাত, ছিয়াম, কুরআন তেলাওয়াত, ভালো কাজ, দান-ছাদাক্বা, সদ্ব্যবহার, আল্লাহর যিকির, ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা সব ভালো কাজগুলোই চলমান রয়েছে, এগুলো থেমে যায়নি অথবা এগুলো থেকে বিরত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

সুতরাং ছালাত হলো দ্বীনের দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ। আল্লাহ তাআলা সর্বদাই ছালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ‘তোমরা ছালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা দাঁড়াবে বিনীতভাবে’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৩৮)*।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ করো, সিজদা করো, তোমাদের রবের ইবাদত করো এবং ভালো কাজ করো, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে’ *(আল-হাজ্জ, ২২/৭৭)*।

যারা এই ছালাতকে বিনষ্ট করবে এবং অলসতাবশত তা ত্যাগ করবে তাদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ বলেন বলেন, ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ ‘তাদের পরে আসল অযোগ্য উত্তরসূরীরা, তারা ছালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। কাজেই অচিরেই তারা ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন হবে’ *(মারইয়াম, ১৯/৫৯)*। তিনি আরও বলেন, ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ-إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ-فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ-عَنِ الْمُجْرِمِينَ-مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ-قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ ‘প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। কিন্তু ডান দিকের লোকেরা নয়। তারা থাকবে জান্নাতে এবং তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অপরাধীদের সম্পর্কে, তোমাদেরকে কীসে সাক্বার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা ছালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না’ *(আল-মুদ্দাছছির, ৭৪/৩৮-৪৩)*।

যাকে আল্লাহ তাআলা এ রামাযান মাসে ছালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য সাহায্য করেছেন, তুমি সেই ছালাতকে বিনষ্ট করো না। কেননা এ ছালাতই তোমার রবের সাথে সম্পর্ক

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

স্থাপনকারী। এই ছালাত তোমার পাপ থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে সাহায্য করবে এবং তোমাকে পবিত্র করবে, সুবহানাল্লাহ!

عن أبي هريرةَ ﷺ أن النبيَّ ﷺ قال: مَن غدا إلى المسجدِ أو راح، أَعَدَّ اللهُ له نُزُلاً في الجنةِ كُلَّما غَدَا أو راح.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন, যতবারই সে সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়’।[৭৫]

ছহীহ বুখারীতে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমরা কী বলো, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে; তবে কি তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে?’ ছাহাবীগণ বললেন, না, তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তখন তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘এটাই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের দৃষ্টান্ত; আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে গুনাহসমূহ মুছে দেন’।[৭৬]

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপরে ছালাত ফরয করেছেন এবং তিনি তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে তা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তারা যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সর্বপ্রথম তিনি তাদেরকে ছালাত সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করবেন।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের উপর ছালাত ফরয করেছেন এবং প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেক অবস্থায় তাদেরকে এর মাধ্যমে ইবাদতে আবদ্ধ করেছেন, যতক্ষণ না তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন তিনি সর্বপ্রথম তাদেরকে ছালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন, যেমনটি হাদীছে এসেছে,

عن أبي هريرةَ ﷺ أن النبيَّ ﷺ قال: إن أَوَّلَ ما يُحاسَبُ بِهِ العبدُ يَومَ القيامةِ مِن عَملِهِ صلاتُهُ فَإِنْ صَلَحَت فقد أفلح وأنجح وإِنْ فسدت فقد خاب وخسر.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম যার হিসাব নেওয়া হবে, তা হলো তার ছালাত। যদি তার ছালাত সঠিক হয়, তবে সে সফল ও কৃতকার্য হবে আর যদি তার ছালাত নষ্ট হয়, তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে’।[৭৭]

৭৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৬৯।
৭৬. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৬৭।
৭৭. আবূ দাঊদ, হা/৮৬৪, হাদীছটি ছহীহ।

শাওয়াল মাসের ছিয়াম:

ছিয়াম রামাযানের হলে তা ফরয হয়, অন্যথা নফল হয়, যা সারা বছর শরীআতে অনুমোদিত। এখানে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম আছে, সে সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَن أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

আবূ আইয়ূব আনছারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালনের পর শাওয়াল মাসের ছয় দিন ছিয়াম রাখল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখল’।[৭৮]

আরাফার ছিয়াম, আশূরার ছিয়াম, সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন ছিয়াম:

নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরাফা ও আশূরার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে বলেছেন, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ‘আরাফার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি এর দ্বারা আগের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর আশূরার দিনের ছিয়াম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি এর দ্বারা আগের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন’।[৭৯]

قال أبو هريرةَ ﷺ أوصاني خليلي بثلاثٍ: أن أصومَ مِن كُلِّ شهرٍ ثَلاثةَ أيَّامٍ وأن أُصَلِّيَ ركعتَي الضُّحى وأن أوترَ قَبلَ أن أنامَ. ويقولُ ﷺ في يومِ الاثنينِ: ذاك يومٌ وُلِدتُ فيه ويومٌ بُعِثتُ فيه ويومٌ أُنزِلَ عليَّ فيه وتقولُ عائشةُ ﷺ كان رسولُ اللهِ يتَحَرَّى صيامَ الخميسِ والاثنينِ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমার বন্ধু (রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন, প্রতি মাসে তিন দিন ছিয়াম রাখা, যুহার দুই রাকআত ছালাত আদায় করা এবং ঘুমানোর আগে বিতর ছালাত পড়ে নেওয়া। আর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সোমবারের ছিয়াম সম্পর্কে বলেছেন, ‘এটি সেই দিন, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমাকে নবুঅত দেওয়া হয়েছে এবং যেদিন আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে’। আর আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম রাখার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।[৮০]

৭৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮১৫; আবূ দাঊদ, হা/২৪৩৫; তিরমিযী, হা/৭৫৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৭১৬।
৭৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২।
৮০. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৮১।

নবী ﷺ আরও সংবাদ দিয়েছেন যে, ‘এই দুই দিনে (সোমবার ও বৃহস্পতিবার) বান্দার আমল আল্লাহর কাছে পেশ করা হয়’ আর তিনি ﷺ বলেছেন, ‘আমি পছন্দ করি, আমার আমল আমার রবের কাছে পেশ করা হোক এমন অবস্থায় যে আমি ছিয়াম পালনকারী’।[৮১]

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ শা‘বান মাসে এত বেশি ছিয়াম রাখতেন, যতটা অন্য মাসগুলোতে রাখতেন না। কারণ এটি রামাযানের আগে এমন একটি মাস, যার ব্যাপারে মানুষ গাফেল থাকে।[৮২]

তিনি ﷺ আরও জানিয়েছেন যে, ‘রামাযানের পর সর্বোত্তম ছিয়াম হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের ছিয়াম’।[৮৩] তিনি দাউদ আলাইহিস সালাম -এর ছিয়ামের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন, এক দিন ছিয়াম রাখা এবং এক দিন ইফতার করা।[৮৪]

কুরআন তেলাওয়াত:

কুরআন আত্মার পানীয় ও আহার, রূহের নিরাময় ও তার শক্তি, স্থায়িত্ব ও জাগরণের মূল উৎস। বলুন, রূহ ছাড়া কি কোনো মুমিন জীবিত থাকতে পারে? জীবনের মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কি কোনো মুমিনের অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে? আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ ‘নিশ্চয়ই এই কুরআন সেই পথের দিশা দেয়, যা সবচেয়ে সরল ও সঠিক’ *(আল-ইসরা, ১৭/৯)*।

কুরআন হলো এক সুদৃঢ় রজ্জু, যার এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে আর অপর প্রান্ত তোমাদের হাতে। যে এই মযবূত রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং কখনো ধ্বংসও হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اقرؤوا القرآنَ فإنه يأتي يَومَ القيامةِ شفيعًا لأصحابِهِ اقرؤوا الزَّهرَاوَينِ: البقرةَ وآلَ عمرانَ؛ فإنهما تأتيانِ يَومَ القِيامةِ كأنهما غمامتانِ أو غيايتانِ، أو كأنهما فِرقانِ مِن طَيرٍ صَوَافَّ تحاجان عن صاحبِهما.

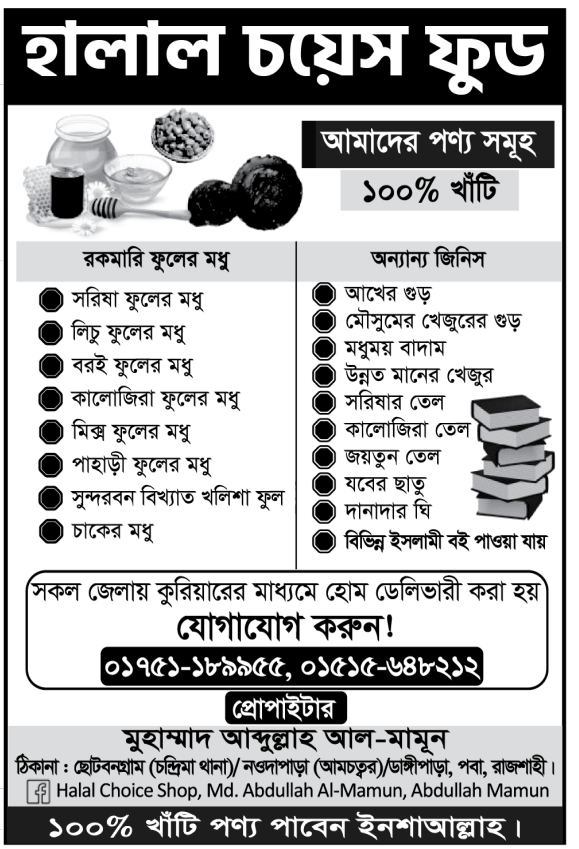
‘তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো, কেননা ক্বিয়ামতের দিন এটি তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে। তোমরা দুই উজ্জ্বল বস্তু সূরা বাক্বারা ও আলে ইমরান পাঠ করো। কারণ ক্বিয়ামতের দিন এ দুটি এমনভাবে আসবে, যেন দুটি মেঘ অথবা দুটি ছায়ামণ্ডল কিংবা যেন সারিবদ্ধ পাখির দুটি ঝাঁক, যা তাদের পাঠকের পক্ষে সুপারিশ করবে’।[৮৫]

তিনি ﷺ আরও বলেন, لا حَسَدَ إلا في اثنتين: رجلٍ آتاه اللهُ القرآنَ فهو يتلوه آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ، ورجلٍ أعطاه اللهُ مالاً فهو يُنفِقُهُ آناءَ الليلِ وآناءَ النهارِ". أيْ في سائرِ العامِ ‘দুটি বিষয় ছাড়া হিংসা (ঈর্ষা) নেই— এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, সে রাতদিন সবসময় তা তেলাওয়াত করে। আর আরেক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, সে রাতদিন সবসময় তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে’।[৮৬] অর্থাৎ সারা বছর জুড়েই।

অতএব, হে কুরআনের উম্মত! রামাযানের পরে কুরআনকে পরিত্যাগ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য কুরআন থেকে একটি দৈনিক নির্ধারিত পাঠ স্থির করো এবং নিয়মিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত বজায় রাখো।

[অনুবাদ সোর্স: যাদুল খত্বীব আদ-দাওয়াহ]

৮১. তিরমিযী, হা/৭৪৭, হাদীছটি ছহীহ।
৮২. নাসঈ, হা/২১৫১, ‘হাসান’।
৮৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪; মিশকাত, হা/২০৩৯।
৮৪. ছহীহ বুখারী, হা/১১৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।
৮৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৪।
৮৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৬।



ঈদের মাসায়েল

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা:

‘ঈদ’ (عيد) শব্দটি আরবী, যা ‘আউদুন’ (عود) মাছদার থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো— উৎসব, পর্ব, ঋতু, মৌসুম,[৮৭] প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন[৮৮] ইত্যাদি। প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে বলে একে ‘ঈদ’ বলা হয়।[৮৯]

২য় হিজরী সনে ছিয়াম ফরয হওয়ার সাথে সাথে ‘ঈদুল ফিত্বর’-এর সূচনা হয়।[৯০] রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পরে দেখলেন যে, মদীনাবাসী বছরে দুদিন খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করে। তখন তিনি তাদেরকে উক্ত দুদিন উৎসব পালন করতে নিষেধ করেন এবং ‘ঈদুল ফিত্বর’ ও ‘ঈদুল আযহা’-কে মুসলিমদের জন্য আনন্দের দিন নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন, قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهَا يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য ঐ দুদিনের পরিবর্তে দুটি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন— ‘ঈদুল আযহা’ ও ‘ঈদুল ফিত্বর’।[৯১]

ঈদের ছালাতের আগে করণীয়:

(১) ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বা ফিত্বরা আদায় করতে হবে ঈদগাহে বের হওয়ার আগেই। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক ছা‘ (প্রায় ২.৫০ কেজি) পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ফিত্বরা হিসাবে আদায় করা ফরয।[৯২] উল্লেখ্য, ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার আগেই ফিত্বরা আদায় করতে হবে। তবে, সর্বোচ্চ ২/১ দিন পূর্বেও আদায় করা যায়।

(২) পুরুষগণ ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে মিসওয়াক ও ওযূ-গোসল করে, তৈল-সুগন্ধি ব্যবহার ও সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করে সুসজ্জিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।[৯৩] মহিলারা আভ্যন্তরীণভাবে সুসজ্জিত হবে। তারা সুগন্ধি মেখে ও বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রদর্শনী করে বের হবে না। তারা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করবে না।

(৩) মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে শরীর আবৃত করে তথা পর্দার বিধান মেনে পুরুষদের পিছনে ঈদের জামাআতে শরীক হবে। ঋতুমতী মহিলারা কাতার থেকে সরে ঈদগাহের এক পার্শ্বে অবস্থান করবে। তারা কেবল খুৎবা শ্রবণ এবং দু‘আয় অংশ গ্রহণ করবেন।[৯৪] এখানে দু‘আ বলতে সম্মিলিত দু‘আ বুঝানো হয়নি।

(৪) ঈদুল ফিত্বরের দিন সকালে ঈদগাহের দিকে ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিজোড় সংখ্যক খেজুর কিংবা অন্য কিছু খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিনে কিছু না খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল।[৯৫]

(৫) পায়ে হেঁটে এক পথে ঈদগাহে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে আসা সুন্নাত।[৯৬]

ঈদের দিনের তাকবীর এবং তা পড়ার নিয়ম:

রামাযান মাসের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর তথা ঈদের রাত্রি থেকে তাকবীর পাঠ শুরু করতে হয় *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। এটা ঈদের খুৎবা শুরুর পূর্বপর্যন্ত চলতে থাকবে।[৯৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে ঈদের দিন সকালে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করতে করতে ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা দিতেন এবং এভাবে তিনি ঈদগাহে পৌঁছে যেতেন।[৯৮] ঈদের তাকবীরের শব্দগুলো নিম্নরূপ:

أَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।৯৯ উল্লেখ্য, মহিলারা নিঃশব্দে তাকবীর পাঠ করবে।[১০০]

ঈদের ছালাতের সময়, স্থান ও মাসায়েল:

(১) সূর্য উদিত হলে আনুমানিক ১৫ মিনিটি পর ঈদের ছালাতের সময় শুরু হয় এবং সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত এর সময় বাকী থাকে। এটাই জমহূর আলেমের

৮৭. ড. ফজলুর রহমান, আল-মু‘জামুল ওয়াফী, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৭২৬।
৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪।
৮৯. মুস্তফা সাঈদ ও সহযোগীবৃন্দ, আল ফিক্বহুল মানহাজী, ১/২২২।
৯০. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়ায : দারুস সালাম, ১৪১৪/১৯৯৪), পৃ. ২৩১-৩২।
৯১. আবূ দাঊদ, হা/১১৩৪; নাসাঈ, হা/১৫৫৬; মিশকাত, হা/১৪৩৯।
৯২. ছহীহ বুখারী, হা/১৫১১।
৯৩. ছহীহ বুখারী, হা/৮৮৬; মিশকাত, হা/১৩৮১।
৯৪. ছহীহ বুখারী, হা/৯৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০।
৯৫. তিরমিযী, হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৬।
৯৬. ইবনু মাজাহ, হা/১৩০১; দারেমী, হা/১৬১৩; আহমাদ, হা/৮১০০; মিশকাত, হা/১৪৪৭।
৯৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল (বৈরূত : ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), ৩/১২৫।
৯৮. বায়হাক্বী, ৩/২৭৯, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/৬৫০, ৩/১২৩।
৯৯. আল-মু‘জামুল কাবীর, হা/৯৫৩৮; দারাকুত্বনী, হা/১৭৫৬।
১০০. তাফসীরে কুরতুবী, ২/৩০৭, ৩/২-৪; বায়হাক্বী, ৩/৩১৬।

www.al-itisam.com

মত।[১০১] ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ঈদের ছালাতের সময় সম্পর্কিত সকল হাদীছ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল আযহা এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল ফিত্বরের ছালাত আদায় করা উত্তম।[১০২]

(২) খোলা ময়দানে ঈদের ছালাত জামাআতসহ আদায় করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীন সর্বদা ঈদের ছালাত খোলা ময়দানে আদায় করতেন।[১০৩] বৃষ্টি, ভীতি কিংবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে উন্মুক্ত ময়দানে ছালাত আদায় অসম্ভব হলেই কেবল মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা যায়।[১০৪] বায়তুল্লাহ ব্যতীত বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে বিনা কারণে ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করা সুন্নাতবিরোধী কাজ।

(৩) ঈদের ছালাতের জন্য কোনো আযান কিংবা ইক্বামত নেই।[১০৫] ঈদের ছালাতের জন্য মানুষকে ডাকাডাকি করা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।[১০৬]

(৪) জামাআতের পরে ঈদের ছালাতের খুৎবা হবে। জামাআতের পূর্বে কোনো খুৎবা প্রদানের বিধান শরীআতসম্মত নয়।[১০৭] ঈদের ছালাতের খুৎবা একটি।[১০৮] একটি খুৎবা প্রদানই ছহীহ হাদীছসম্মত।

(৫) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে ঈদগাহে যাওয়ার সময় একটি লাঠি বা বল্লম নিয়ে যাওয়া হতো এবং ছালাত শুরু হওয়ার পূর্বে তা সুতরা হিসাবে ইমামের সামনে মাটিতে গেড়ে দেওয়া হতো।[১০৯] ঈদের ছালাতের পূর্বে কোনো সুন্নাত কিংবা নফল ছালাত নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করেননি।[১১০]

(৬) ঈদের জামাআত না পেলে দু'রাকআত ক্বাযা আদায় করতে হবে।[১১১]

(৭) ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরামের পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ 'তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা'। অর্থাৎ 'আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হতে কবুল করুন!'[১১২]

(৮) দান-ছাদাক্বা করা ঈদের দিনের অন্যতম নফল ইবাদত। এদিনে দান-ছাদাক্বার গুরুত্ব এত বেশি যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই খুৎবা শেষ করে বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে নিয়ে মহিলাদের সমাবেশে গেলেন ও তাদেরকে দান-ছাদাক্বার নির্দেশ দিলেন। মহিলারা নেকীর উদ্দেশ্যে নিজেদের গয়না খুলে বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাতে দান করলেন।[১১৩]

ঈদের ছালাতের তাকবীর সংখ্যা:

ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ ছাড়াও ১২ তাকবীরের পক্ষে অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবীগণ থেকে প্রায় অর্ধশতাধিক শুধু ছহীহ হাদীছই বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ছয় তাকবীরের প্রমাণে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না। অথচ এটিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজ আজ দ্বিধা বিভক্ত। নিম্নে কতিপয় দলীল প্রদত্ত হলো, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا 'ঈদুল ফিত্বর-এর প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। আর উভয় রাকআতে ক্বিরাআত পড়তে হবে তাকবীরের পর'।[১১৪]

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার ছালাতে (রুকূর দুই তাকবীর ছাড়া) প্রথমে সাত আর পরে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[১১৫] ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুই ঈদের তাকবীর হবে— প্রথম রাকআতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ'।[১১৬] উক্ত হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ ছহীহ বলেছেন।[১১৭]

এছাড়াও আরও অনেক আছার বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর গোলাম নাফে' থেকে বর্ণিত, شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 'আমি ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বর-এর ছালাতে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথম রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন'।[১১৮] ইমাম মালেক, ইমাম বুখারী, তিরমিযী, বায়হাক্বী, দারাকুত্বনী, আলবানী রহিমাহুল্লাহ-সহ

বাকি অংশ ৩০ নং পেজে...

১০১. ইবনু আবেদীন, ১/৫৮৩।
১০২. যাদুল মাআদ।
১০৩. ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯।
১০৪. আল-মুগনী, ২/২৩৫; ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৩১৮।
১০৫. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৬।
১০৬. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৩।
১০৭. ছহীহ বুখারী, হা/৯৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৪।
১০৮. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/৫৩৫।
১০৯. ছহীহ বুখারী, পৃ. ১৩৩।
১১০. ছহীহ বুখারী, হা/৯৮৯; তিরমিযী, হা/৫৩৭।
১১১. ছহীহ বুখারী, ২/২৩।
১১২. তামামুল মিন্নাহ, ১/৩৫৪, সনদ হাসান।
১১৩. ছহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১৪২৯।
১১৪. আবূ দাঊদ, হা/১১৫১ ও ১১৫২, সনদ ছহীহ।
১১৫. ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০; আবূ দাঊদ, হা/১১৪৯, সনদ ছহীহ।
১১৬. তারীখু ইবনু আসাকির, ১৫/১৬, হা/১১৫৩৫ ও ১১৫৩৬, (৫৪/৩৭৯), ২/১৬৫; তারীখে বাগদাদ, ২/৪১৩ (১০/১৬৪)।
১১৭. তারীখু বাগদাদ, ২/৪১৩; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০; ইবনু মাজাহ, হা/১০৬২।
১১৮. আল-মুওয়াত্ত্বা, ১/১৮০ (১০৮-১০৯)।

শাওয়াল মাসের ছিয়ামের গুরুত্ব

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

রামাযানের পরের মাস শাওয়াল। এ মাসের ছিয়ামের গুরুত্ব ও ফযীলত অনেক। এ মাস মুসলিম উম্মাহর কাছে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কারণ রামাযানের ছিয়াম পালনকারীরা এ মাসের ছয়টি ছিয়াম রাখলেই সারা বছর ছিয়াম রাখার ছওয়াব পায়। এ সম্পর্কে হাদীছে বেশ কিছু বর্ণনা রয়েছে, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা পর্যায়ক্রমে সেগুলো আলোচনা করব।

শাওয়াল মাসের নামকরণের কারণ:

শাওয়াল আরবী বর্ষপঞ্জির দশম মাস। শাওয়াল শব্দের অর্থ হলো উঁচু হওয়া, উপরে তুলে ধরা, উঠানো, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। শাওয়াল মাসের নামকরণ নিয়ে একাধিক মতামত পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

(ক) এ মাসে উট উটনীর সাথে মিলিত হতো এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে লেজ উপরে উঠিয়ে রাখত। এ দিকে লক্ষ রেখে এ মাসের নাম রাখা হয় শাওয়াল।

(খ) শাওয়ালের একটি অর্থ হলো হ্রাস পাওয়া বা কমে যাওয়া। বলা হয়ে থাকে, এ মাসে জন্তু-জানোয়ারের দুধ কমে যেত। তাই এ মাসের নামকরণ করা হয়েছে শাওয়াল।

(গ) আরবরা এ মাসে আনন্দ-ফুর্তির উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত। তারা খুব তেজোদীপ্ত গতিতে তাদের উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। ফলে উটগুলো নিজেদের লেজ উপরে উঠিয়ে রাখত। এ দিকে লক্ষ রেখে এ মাসের নাম রাখা হয় শাওয়াল।

(ঘ) আরবরা এ মাসে শিকারের উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে বন-বাদাড়ে দাপিয়ে বেড়াত। তাদের থেকে বন-বাদাড়ের জীব-জন্তু ভয়ে বিভিন্ন এলাকায় পালিয়ে যেত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। এ কারণে এ মাসের নাম রাখা হয় শাওয়াল।

(ঙ) একটি দুর্বল হাদীছে শাওয়াল মাসের নামকরণের ব্যাপারে বলা হয়েছে, وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَوَّالُ لِأَنَّهُ يَشُوْلُ الذُّنُوْبَ كَمَا تَشُوْلُ النَاقَةُ ذَنَبَهَا ‘এ মাসকে শাওয়াল নাম দেওয়া হয়েছে, কারণ এ মাসে মানুষের গুনাহ উঠিয়ে নেওয়া হয়, যেমন উটনী তার লেজ উঠিয়ে নেয়’।[১২৮]

শাওয়াল মাসের অন্যান্য নাম:

আইয়ামে জাহিলিয়্যাতে এ মাসকে ওয়াইল, আদিল ও জীফল বলা হতো। বর্তমানে অনেক জায়গায় এ মাসকে ‘ঈদের মাস’ বলা হয়। প্রতিটি অর্থের সঙ্গেই শাওয়াল মাসের রয়েছে গভীর সম্পর্ক।

আর শাওয়াল মাসের আমলে উন্নতি লাভ হয়, নেকীর পাল্লা ভারী হয়, আমলে সাফল্য আসে, কল্যাণ প্রত্যাশীরা আল্লাহর কাছে উভয় হাত প্রসারিত করে প্রার্থনায় মগ্ন হয়। মুমিনরা রামাযানের পূর্ণ মাস ছিয়াম পালনের পর আরও কয়েকটি ছিয়াম রাখার আনন্দে বিভোর হয়। যে ছিয়ামের বরকতে বছরজুড়ে ছিয়াম রাখার ছওয়াব মিলে। এ সবই শাওয়াল মাসের আমলের সার্থকতা।

শাওয়াল মাসে ছয়টি ছিয়াম রাখা মূলত সুন্নাত, যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তা আমল করেছেন এবং আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু পরিভাষায় এগুলোকে নফল ছিয়াম বলা হয়। কারণ এগুলো ফরয ও ওয়াজিব নয়; বরং অতিরিক্ত তথা নফল। এ মাসে ছয়টি নফল ছিয়াম রাখা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যারা রামাযানে ছিয়াম পালন করবে এবং শাওয়ালে আরও ছয়টি ছিয়াম রাখবে, তারা যেন সারা বছরই ছিয়াম পালন করল’।[১২৯]

সুধী পাঠক! জানার বিষয় হচ্ছে, শাওয়াল মাসের এ ছিয়াম কখন রাখবেন? এ ছিয়াম রাখার উপকারিতা কী? রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম থাকলে এ ছিয়াম রাখার হুকুম কী? এরকম আরও অনেক বিষয় জানার আছে।

মূলত শাওয়াল মাসের যেকোনো সময় এই ছিয়াম রাখা যায়। ধারাবাহিকভাবে বা মাঝে মাঝে বিরতি দিয়েও আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ শাওয়াল মাসে ছয়টি নফল ছিয়াম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম প্রসঙ্গে অনেকেরই বিশেষ কিছু প্রশ্ন আছে, যেগুলোর উত্তর অনেকেই জানেন না। তাদের জন্য বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

শাওয়াল মাসে ছয়টি নফল ছিয়াম রাখলে কী উপকার হবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রামাযান মাসের ছিয়াম রাখল, এরপর শাওয়াল মাসে (পুরো শাওয়াল মাসের মধ্যে যেকোনো সময়) ছয়টি ছিয়াম রাখল, সে ব্যক্তি সারা বছর ছিয়াম রাখার সমান ছওয়াব পাবে’।[১৩০]

* চিকিৎসক, কলামিষ্ট ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

১২৮. সিলসিলা যঈফা, হা/১১৬৪।

১২৯. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪।

১৩০. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪।

কেন সারা বছর ছিয়াম রাখার ছওয়াব পাবে?

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে বলেছেন, রামাযান মাস ২৯ বা ৩০ দিন হয়ে থাকে। যদি ৩০ ধরা হয় আর শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম ধরা হয়, তবে ছিয়াম হয় ৩৬টি। আর আল্লাহ তাআলার ঘোষণা দিয়েছেন, 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে তার জন্য আছে ১০ গুণ পুরস্কার' *(আল-আনআম, ৬/১৬০)*।

সেই হিসাবে রামাযান মাসের ৩০টি ছিয়ামকে ১০ দ্বারা গুণ করলে (৩০×১০=৩০০) হয় ৩০০ দিন। আর শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামকে ১০ দ্বারা গুণ করলে (৬×১০=৬০) হয় ৬০ দিন। অতএব, সর্বমোট দিন হয় ৩৬০। আর আরবী বছর হয় ৩৬০ দিনে। এভাবে শাওয়াল মাসের ৬ দিন ছিয়াম রাখলে সারা বছর ছিয়াম রাখার অনুরূপ হয়।

উপর্যুক্ত হিসাব সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জানিয়ে দিয়েছেন। চলুন সরাসরি তাঁর মুখ থেকে সেই হিসাব শুনি। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 'যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর ছয় দিন ছিয়াম রাখল, তা পূর্ণ বছর ছিয়াম রাখার সমতুল্য। কেউ কোনো সৎকাজ করলে, সে তার ১০ গুণ পাবে'।[১৩১] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ تَمَامُ السَّنَةِ। 'রামাযানের এক মাস ছিয়াম ১০ মাস ছিয়ামের সমান এবং রামাযানের পর ছয় দিন ছিয়াম দুই মাস ছিয়ামের সমান। এভাবে (রামাযানের পুরো মাস ও শাওয়ালের ছয় দিন ছিয়াম) এক বছর ছিয়ামের সমান হয়'।[১৩২]

শাওয়ালের ছিয়াম কি একটানা রাখতে হবে?

শাওয়ালের ছিয়াম কি একটানা রাখতে হবে নাকি বিরতি দিয়ে আলাদা আলাদা রাখা যাবে? এর সঙ্গে ছিয়াম হওয়া বা না হওয়ার বিষয় জড়িত আছে কি না?

এর উত্তর হলো- শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম একটানা না রেখে বিরতি দিয়ে আলাদা আলাদা রাখলেও আদায় হয়ে যাবে। কেউ যদি একটানা ছিয়াম রাখে, তাতেও আদায় হয়ে যাবে। কারণ হাদীছের কোনো বর্ণনায় শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম একসঙ্গে রাখার ব্যাপারে কোনো শর্ত দেওয়া হয়নি।

১৩১. ইবনু মাজাহ, হা/১৭১৫, হাদীছ ছহীহ।
১৩২. নাসাঈ, হা/২৮৭৩, হাদীছ ছহীহ।

শাওয়ালের ছিয়াম রাখার সহজ উপায় কী?

সাপ্তাহিক ও মাসিক (আইয়্যামে বীয) ছিয়ামের সঙ্গে মিল রেখে সহজেই শাওয়ালের ছিয়ামগুলো রাখা যায়। আর এতে বেশি কষ্টও হয় না। কারণ সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখলেই পুরো মাসে সহজে ছয়টি ছিয়াম রাখা সহজ হয়ে যায়। আবার আইয়্যামে বীযের তিনটি ছিয়াম একসঙ্গে রেখে অন্য সময়ে তিনটি ছিয়াম রাখার মাধ্যমেও ছয়টি ছিয়াম রাখা যায়। তবে কেউ যদি একটানা ছয়টি ছিয়াম রাখে, তাতেও কোনো সমস্যা নেই।

শাওয়াল মাসে ছয়টি ছিয়াম না রেখে পরের কোনো সময় এ ছিয়াম রাখলে হাদীছে ঘোষিত ছওয়াব পাওয়া যাবে কি?

না, শাওয়াল মাস চলে যাওয়ার পর (অন্য মাসে) ছয়টি ছিয়াম (ক্বাযা) রাখলে হাদীছে ঘোষিত ছয়টি ছিয়ামে সারা বছর ছিয়াম রাখার ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ ছয়টি ছিয়াম রামাযানের ছিয়াম পালনকারীর জন্য শাওয়াল মাসের মধ্যে রাখার শর্ত দেওয়া হয়েছে। যারা শর্ত পূরণ করতে পারবে, তারাই বছরজুড়ে ছিয়াম রাখার ছওয়াব পাবে। এ ছওয়াব শাওয়াল মাসে ছিয়াম রাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শাওয়াল মাসের ছিয়াম রাখার জন্য তারাবীহ ছালাত পড়তে হবে কি?

না, শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়ামের জন্য তারাবীহ ছালাত আদায় করতে হবে না। রামাযান মাসের ছিয়াম রাখার সময় রাতে যেভাবে তারাবীহ আদায় করা হয়, সেভাবে শাওয়াল মাসের ছিয়ামের জন্য তারাবীহ পড়তে হবে না।

শাওয়াল মাসের ফযীলত ও গুরুত্ব:

শুধুই কি ছওয়াব আর কল্যাণেই সীমাবদ্ধ শাওয়াল মাস ও ছয়টি ছিয়াম? না, এ শাওয়াল মাস ও ছয়টি ছিয়াম শুধু ছওয়াব ও কল্যাণে সীমাবদ্ধ নয়। বরং পুরো বছরই ছিয়ামের আমেজ নিয়ে জীবন কাটানোর বিশেষ সুবিধা দেয়। শাওয়াল মাসে ছয়টি ছিয়াম রাখার ব্যাপারে এমনই ঘোষণা দিয়েছেন স্বয়ং বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদীছে এসেছে, আবূ আইয়ূব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসের ছিয়াম রাখল এবং শাওয়াল মাসে ছয়টি ছিয়াম রাখল, এটি (শাওয়ালের ছয় ছিয়াম) তার জন্য সারা বছর ছিয়াম রাখার সমতুল্য'।[১৩৩]

১৩৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৪।

(১) গরীবের মুখে হাসি ফোটানোর মাসও শাওয়াল: এ মাসটি গরীবের মুখে হাসি ফোটানোর মাস। ইসলামের অন্যতম প্রধান দুইটি বিনোদনের একটি এ মাসের প্রথম দিন উদযাপিত হয়। সামর্থ্যবান মুসলিমরা এ মাসের প্রথম দিন গরীব-দুঃখী মানুষকে নিজেদের সঙ্গে ঈদ আনন্দে শরীক করতে অকাতরে দান করেন। ঈদগাহে এক কাতারে ছালাত আদায় করেন। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক কাতারে দাঁড়ানোর মাধ্যমেই সাম্যের বাণী ঘোষণা করে ইসলাম এবং তা বাস্তবে প্রমাণ করার দিনটি এ মাসেই নির্ধারিত। গরীব-অসহায় মানুষ এ শাওয়ালে হাসিমুখে ধনীদের সঙ্গে ঈদ আনন্দ উদযাপন করেন, যা বছরের অন্য দিন ও মাসের তুলনায় পুরোপুরি ভিন্ন।

(২) দু'আ ও ইবাদত কবুলের মাস শাওয়াল: শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম শুধু বছরজুড়ে ছিয়াম পালনের আমেজ ও ছওয়াব পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং যে সময় থেকে শাওয়াল মাস শুরু হয়, সে সময়টি ছিয়াম পালনকারী বান্দার জন্য বিশেষ মূল্যবান।

ঈদের আগের রাত তথা চাঁদরাত বলতে শাওয়ালের প্রথম রাতকেই বুঝানো হয়। এ রাতের ইবাদতকারীর জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। বান্দা আল্লাহর কাছে যা চায়, তা-ই পান। কেননা এ রাতের কোনো প্রার্থনাকারীকে আল্লাহ তাআলা খালি হাতে ফেরত দেন না।

(৩) আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাস শাওয়াল: হজ্জের মাসের আগে এ শাওয়াল মাসেই আল্লাহ তাআলার তাকবীরের সূচনা হয়। শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার পর এটা শুরু হয়। যদিও তা ঈদের ছালাত পড়ার আগ পর্যন্ত পড়তে হয়, কিন্তু আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা শুরু হয় এ শাওয়াল মাসের প্রথম প্রহরে। এ দিক থেকেও শাওয়াল মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা স্বীকৃত। তাকবীর হলো 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবর, ওয়া লিল্লাহিল হামদ'।

(৪) পরিপূর্ণ বরকত ও কল্যাণের মাস শাওয়াল: শাওয়াল শব্দের মধ্যেও এ মাসের মাহাত্ম্য লুকায়িত আছে। শাওয়াল অর্থই হচ্ছে প্রসারিত করা, পূর্ণতা দান করা কিংবা উন্নতকরণ। মূলকথা হলো মহান রাব্বুল আলামীন বান্দার আবেদন-নিবেদনে চাওয়ার হাতকে বরকত ও কল্যাণে ভরপুর করে দেন। আমল-ইবাদত ও ছিয়াম পালনে নিজের আমলকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করে নেন মুমিন। ফলে এ মাসে খুব সহজেই মহান রবের সন্তুষ্টি পেয়ে যায় মুমিন।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে বছরজুড়ে ছিয়াম রাখার ছওয়াব ও ভরপুর কল্যাণ পাওয়ার জন্য শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম রাখার তাওফীক্ব দান করুন এবং শাওয়াল মাসের আমলগুলো যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

ঈদের মাসায়েলের বাকি অংশ

অন্যান্য মুহাদ্দিছ উক্ত আছারকে 'ছহীহ' বলেছেন।[১১৯] আম্মার ইবনু আবী আম্মার বর্ণনা করেন, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ 'ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীর দিতেন। প্রথম রাকআতে সাত আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[১২০] ইমাম বায়হাক্বী ও আলবানী রহিমাহুমাল্লা-হ একে 'ছহীহ' বলেছেন।[১২১]

ঈদের ছালাত আদায়ের সংক্ষিপ্ত নিয়ম:

ঈদের ছালাত দু'রাকআত।[১২২] নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে হাত বাঁধতেন। অতঃপর ছানা পড়তেন।[১২৩] অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বেই এক এক করে মোট সাতটি তাকবীর দিতেন। প্রত্যেক দু'তাকবীরের মাঝে তিনি একটু চুপ থাকতেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু'হাত উঠাতেন এবং পরে আবার হাত বাঁধতেন।[১২৪] এভাবে সাতটি তাকবীর বলার পর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতেহা পড়তেন। এরপর তিনি আরেকটি সূরা মিলাতেন। ঈদের ছালাতে সাধারণত নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকআতে সূরা ক্বাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-ক্বামার পড়তেন।[১২৫] অথবা প্রথম রাকআতে সূরা আল-আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল-গাশিয়া পড়তেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে প্রথম রাকআত শেষ করতেন। সিজদা থেকে উঠে তিনি দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বেই পরপর পাঁচটি তাকবীর দিতেন। অতঃপর সূরা ফাতেহা পড়ে তার সাথে আরেকটি সূরা মিলাতেন। এরপর রুকূ ও সিজদা করে শেষ বৈঠকের মাধ্যমে ছালাত শেষ করতেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি একটি তীরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ঈদের মাঠে মিম্বার নেওয়া হতো না।[১২৬]

মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে ঈদসহ সবক্ষেত্রে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত বাস্তবায়ন করার এবং যাবতীয় বিদআত পরিহার করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১১৯. আল্লামা যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ (রিয়ায ছাপা : ১৯৭৩), ২/২১৮; তালখীছুল হাবীর, ২/২০১; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০।
১২০. ইবনু আবী শায়বা, ২/৮১; বায়হাক্বী, ৩/৪০৭, হা/৬১৮০।
১২১. বায়হাক্বী, ৩/৪০৭; ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১১।
১২২. নাসাঈ, ৩/১৮৩; আহমাদ, ১/৩৭।
১২৩. ইবনু খুযায়মা।
১২৪. যাদুল মাআদ, ১/৪৪১।
১২৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭৮,৮৯১; তিরমিযী, হা/৫৩৪।
১২৬. যাদুল মাআদ, ১/৪২৯।

www.al-itisam.com

ফাযায়েলে আমল

রামাযান ও ছিয়াম সংক্রান্ত

-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)*

১. রামাযান মাসের ছিয়াম পালনকারীর শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের লোকদের প্রতি তা ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

‘রামাযান মাস— যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষের পথপ্রদর্শক, হেদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনারূপে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে ছিয়াম রাখে। আর যে অসুস্থ কিংবা সফরে আছে, সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*।

২. রামাযান মাসে উমরাহ সম্পাদন করার ছওয়াব

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وفي رواية قال فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক আনছারী মহিলাকে বললেন, ‘যখন রামাযান আসবে, তখন আপনি উমরাহ আদায় করবেন। কেননা রামাযান মাসে একটি উমরাহ হজ্জের সমতুল্য। অন্য বর্ণনায় বলেছেন, রামাযান মাসে উমরাহ আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায় করার সমান অথবা বলেছেন, আমার সাথে একটি হজ্জ আদায় করার সমান (ছওয়াব রয়েছে)’।[১৩৫]

শিক্ষা: উমরাহ আদায় করা সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর জীবনে একবার ফরয। তাই তা রামাযান মাসে আদায় করাতে শ্রেষ্ঠত্ব বেশি রয়েছে।

৩. একটি ছিয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় একদিন ছিয়াম পালন করে, তাহলে আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে ৭০ (সত্তর) বছরের রাস্তার দূরত্বে সরিয়ে নেন’।[১৩৬]

শিক্ষা: কাজেই ছহীহ সুন্নাহ মতে, যে সমস্ত নফল ছিয়াম রাখার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তা পালন করা মুসলিমের জন্য কর্তব্য; অবহেলা করা উচিত নয়।

৪. ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করানোর মর্যাদা

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

যায়েদ ইবনু খালেদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি ছিয়ামপালনকারীকে ইফতার করাবে, সে তাদের সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। কিন্তু তাদের ছওয়াব থেকে কোনো কমতি হবে না’।[১৩৭]

শিক্ষা: ইফতার যেকোনো হালাল বস্তু দিয়ে করানো যেতে পারে। যেমন- খেজুর, পানি, রুটি, ফলমূল ইত্যাদি। পেট ভরে খাওয়াতে হবে এমন শর্ত নেই, তবে কেউ খাওয়াতে পারলে উত্তম। কারও নিকট ইফতার করাতে নিজের ছিয়ামের কোনো সমস্যা বা ছওয়াবের কমতি তো নেই, বরং এর বিনিময়ে অন্যকে ছওয়াব দানে সহযোগিতা করা হয়।

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১৩৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৮২, ১৮৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৫৬, ১২৫৭।

১৩৬. ছহীহ বুখারী, হা/২৮৪০, ২০৫৩।

১৩৭. তিরমিযী, হা/৮০৭; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৬৬, হাদীছ ছহীহ।

সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

ক্বিয়ামুল লায়ল ও বিতর

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

সর্বজন সুবিদিত যে, বিতর ছালাতের সময় হচ্ছে, এশার ছালাতের পর থেকে ছুবহে ছাদিকের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ এশার ছালাত এবং ফজর ছালাতের মধ্যবর্তী সময় হচ্ছে বিতর ছালাতের সময়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এশার ছালাত ও ফজরের ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে ১১ রাকআত ছালাত আদায় করতেন। এর মধ্যে এক রাকআত বিতর আদায় করতেন এবং প্রতি দুই রাকআতে সালাম ফিরাতেন।[১৩৮]

১. ক্বিয়ামুল লায়লের জন্য সর্বোত্তম সময়: ক্বিয়ামুল লায়লের জন্য সর্বোত্তম সময় হচ্ছে মধ্যরাতের পরে শেষ-তৃতীয়াংশ। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছালাত হলো দাঊদ b-এর ছালাত আর আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিয়াম হলো দাঊদ (আলাইহিস সালাম) -এর ছিয়াম। দাঊদ (আলাইহিস সালাম) অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতেন এবং রাতের এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন ছিয়াম পালন করতেন, একদিন ছিয়ামবিহীন অবস্থায় থাকতেন'।[১৩৯]

২. মানুষ যদি এই সুন্নাত পালন করতে চায়, তাহলে রাতের হিসাব যেভাবে করবে: রাতের হিসাব করতে হবে সূর্যাস্ত থেকে ছুবহে ছাদিক পর্যন্ত। এই সময়টাকে ছয় ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রথম তিন ভাগ হচ্ছে, রাতের প্রথমার্ধ। ৪র্থ ও ৫ম ভাগে ছালাত আদায় করবে আর এটাই এক-তৃতীয়াংশ। ৬ষ্ঠ ভাগে ঘুমাবে। এ কারণে আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِيْ إِلاَّ نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ (ﷺ) 'আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সাহরীর সময় উপস্থিত হতো'।[১৪০]

৩. ক্বিয়ামুল লায়ল তথা তাহাজ্জুদের ছালাত ১১ রাকআত আদায় করা সুন্নাত: এই পূর্ণতা আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) -এর হাদীছের কারণেই। তিনি বলেছেন, مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً 'আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) রামাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতে) ১১ রাকআতের অধিক ছালাত আদায় করতেন না'।[১৪১] ছহীহ মুসলিমে আরেকটি হাদীছ রয়েছে আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ১৩ রাকআত ছালাত আদায় করতেন। এটা বিতরের ভিন্নতা। অধিকাংশ সময় নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ১১ রাকআত আদায় করতেন। আবার কখনো ১৩ রাকআত আদায় করতেন। এভাবেই আমরা হাদীছদ্বয়ের মাঝে জমা করব।

৪. ক্বিয়াম, রুকূ ও সিজদা দীর্ঘায়িত করা সুন্নাত; যাতে উক্ত রুকনগুলো সমানভাবে আদায় হয়।

৫. ছালাতে কুরআন তেলাওয়াতের সুন্নাতগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে।

৬. দুই রাকআত পরপর সালাম ফিরানো সুন্নাত: আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাতের বেলা ছালাতের পদ্ধতি কী? তিনি বললেন, 'দুই দুই রাকআত করে আর ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলে এক রাকআত মিলিয়ে বিতর পড়ে নিবে'।[১৪২]

দুই দুই রাকআত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুই রাকআত করে ছালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক দুই রাকআত পর সালাম ফিরাবে। এক সালামে চার রাকআত ছালাত আদায় করবে না।

৭. শেষ তিন রাকআতে সূরা পাঠ করা সুন্নাত: প্রথম রাকআতে (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى), দ্বিতীয় রাকআতে (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرونَ) এবং তৃতীয় রাকআতে (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) পাঠ করা। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

১৩৮. ছহীহ বুখারী, হা/২০৩১; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩৬।
১৩৯. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪২০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৯।
১৪০. ছহীহ বুখারী, হা/১১৩৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৪২।
১৪১. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৮১; ছহীহ মুসলিম, হা/৭২১।
১৪২. ছহীহ বুখারী, হা/৯৯০; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৪৯।

ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের প্রথম রাকআতে (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى), দ্বিতীয় রাকআতে (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرونَ) এবং তৃতীয় রাকআতে (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) পাঠ করতেন।[১৪৩]

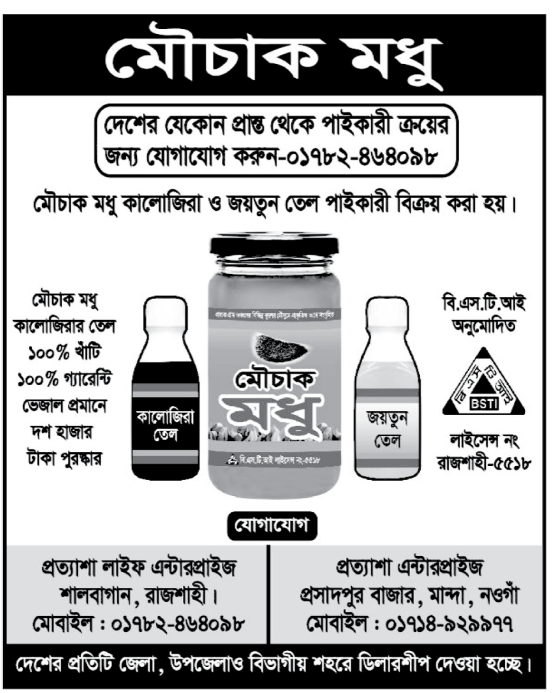
৮. বিতর ছালাতে দু'আ কুনূত পড়া সুন্নাত: কুনূত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দূ'আ। কুনূত পাঠ করবে বিতর ছালাতের তৃতীয় রাকআতে বা শেষ রাকআতে; যে রাকআতে সূরা ইখলাছ পাঠ করা হয়। কুনূত পড়া সুন্নাত। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কুনূত পড়তেন, কখনো ছেড়ে দিতেন। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা রহিমাহুল্লাহ এটাই পছন্দ করেছেন; তবে সর্বোত্তম হচ্ছে, অধিকাংশ সময় ছেড়ে দেওয়া।

৯. রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশে দু'আ করা: রাতের শেষ প্রহরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে দু'আ। যদি রাতের শেষ প্রহরে বিতরের কুনূতে দু'আ করে, তাহলে এতেই যথেষ্ট হবে। যদি বিতরে দু'আ না করে, তাহলে সুন্নাত হচ্ছে এই সময়ে স্বাভাবিকভাবে দু'আ করা। কেননা এই সময়টা হচ্ছে দু'আ কবুলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রতি রাতের শেষ-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের রব আমাদের নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, আমার নিকট দু'আ করবে কে? আমি তার দু'আ কবুল করব। আমার নিকট কে চাইবে? আমি তাকে তা প্রদান করব। আমার কাছে কে তার গুনাহ ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব'।[১৪৪]

১০. বিতরে সালাম ফিরানোর পর 'সুবহানাল মালিকিল ক্বুদ্দূস' তিনবার পাঠ করা এবং তৃতীয়বার উচ্চৈঃস্বরে বলা সুন্নাত: উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের ছালাতে প্রথম রাকআতে (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى), দ্বিতীয় রাকআতে (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرونَ) এবং তৃতীয় রাকআতে (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) পাঠ করতেন। যখন সালাম ফিরাতেন, তখন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ 'সুবহানাল মালিকিল ক্বুদ্দূস' অর্থ: 'আমি পবিত্রতম বাদশাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি' বলতেন।[১৪৫] আব্দুর রহমান ইবনু আবযা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাদীছে বর্ণিত আছে, যখন সালাম ফিরাতেন, তখন سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ 'সুবহানাল মালিকিল ক্বুদ্দূস' বলতেন এবং তৃতীয়বার উচ্চৈঃস্বরে বলতেন।[১৪৬]

১১. তাহাজ্জুদের ছালাতের জন্য পরিবারকে ঘুম থেকে জাগ্রত করা সুন্নাত: স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য সুন্নাত হচ্ছে, তাহাজ্জুদ ছালাতের জন্য একে অপরকে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে ঘুম থেকে জাগ্রত করা। এটা সৎকাজে পারস্পরিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে ছালাত আদায় করতেন। আমি তাঁর ও ক্বেবলার মাঝে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন বিতর ছালাত আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন আমাকে জাগাতেন। অতঃপর আমিও বিতর ছালাত আদায় করে নিতাম।[১৪৭] উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রা হতে জেগে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এ রাতে কতই না বিপদাপদ নেমে আসছে এবং কতই না ভাণ্ডার উন্মুক্ত করা হচ্ছে! অন্য সব ঘরের নারীদেরকেও জাগিয়ে দাও। বহু মহিলা যারা দুনিয়ায় পোশাক পরিহিতা, তারা আখেরাতে হবে বিবস্ত্রা'।[১৪৮]

১৪৩. আবূ দাউদ, হা/১৪২৩; নাসাঈ, হা/১৭৩৩; ইবনু মাজাহ, হা/১১৭১। ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন (নাসাঈ, ১/২৭৩)।
১৪৪. ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫৮।
১৪৫. নাসাঈ, হা/১৭০২। ইমাম নববী ও ইমাম আলবানী রহিমাহুমাল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
১৪৬. নাসাঈ, হা/১৭৩৪। ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন (মিশকাত, ১/৩৯৮)।
১৪৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫১২; ছহীহ মুসলিম, হা/৫১২।
১৪৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬২১৮।



যাকাত দিলে সম্পদ যেভাবে বাড়ে

-রাকিব আলী*

অনেকের মনে একটি প্রশ্ন উঁকি দেয় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত আদায় করলে সম্পদ বাড়ে জেনে আমি তো ঠিকমতো যাকাত আদায় করে থাকি কিন্তু আমার তো সম্পদ বাড়ে না।

দেখুন, যাকাত দিলে সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নিজে বলেছেন,

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

‘মানুষের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় সূদে যা কিছু তোমরা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায় না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা যা দান কর, তার পরিবর্তে তোমরা বহুগুণ প্রাপ্ত হবে’ *(আর-রূম, ৩০/৩৯)*।

আল্লাহ যেহেতু বলেছেন যাকাত দিলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তাই অবশ্যই বাড়ে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা যে অর্থে বৃদ্ধি পাওয়া বুঝি সে অর্থের বাইরেও আরেকটি বৃদ্ধি আছে। আর সেটি হচ্ছে বরকতের বৃদ্ধি। প্রসঙ্গত, বরকত মানে কল্যাণ। উপকারিতা পাওয়া যায় এমন কিছুকে বরকত বলে।

যারা মানুষ দেখানোর জন্য নয়, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যাকাত মনগড়া আদায় না করে আল্লাহর বলা অনুসারে আদায় করে তাদের সম্পদে আল্লাহ বারাকাহ ঢেলে দেন। তাদের অল্প থাকলেও তারা মনে অন্যরকম এক শান্তি অনুভব করে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত দেয় না কিংবা সঠিক পন্থায় যাকাত দেয় না, যাদের যাকাত দেওয়ার পেছনে মানুষ দেখানোর বিষয় কাজ করে তাদের সম্পদে বরকত তথা কল্যাণ থাকে না। সেজন্য তাদের অঢেল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের নিকট সবসময় কম কম মনে হয়। শান্তির সকল উপকরণ হাতের নাগালে থাকা সত্ত্বেও তাদের মনে শান্তি থাকে না, ভেতরে সবসময় অস্থিরতা কাজ করে।

ধরুন, আপনার ব্যাংকে বছরের উপর ১ লক্ষ টাকা পড়ে আছে। এখন আপনার উপর যাকাত ফরয হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আপনি আপনার মাল কমে যাওয়ার ভয়ে আল্লাহর ফরয বিধান লঙ্ঘন করে যাকাত আদায় করলেন না। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আপনার উপর থাকা অন্যের হক্ব তথা যাকাত আদায় না করে আপনি যে কাবীরা গোনাহ করেছেন দুনিয়ার জীবনে তার নগদ শাস্তি হিসেবে আপনার কী হতে পারে, জানেন?

দেখবেন, আপনি বা আপনার পরিবারের কেউ হয়তো হঠাৎ কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার বিল বাবদ আপনার ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। কী, কমে যাওয়ার ভয়ে যে টাকা দিয়ে আপনি যাকাত আদায় করেননি, সে টাকা কি আপনি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পেরেছেন? পারেননি। কোনো না কোনোভাবে তা খরচ হয়েছেই। অথচ আল্লাহর হুকুম পালন করলে আল্লাহই আপনার ঐ টাকার মধ্যে বরকত বাড়িয়ে দিতেন। তখন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বিশাল অংকের যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত খরচ থেকে আল্লাহই আপনাকে বাঁচিয়ে দিতেন। কিন্তু আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে পারেননি, কেবল ভরসা রেখেছিলেন আপনার জমাকৃত টাকার উপর যা শেষ পর্যন্ত আপনার দ্বারা ধরে রাখাই সম্ভব হয়নি।

পক্ষান্তরে, আপনি যদি আল্লাহর নির্দেশ মতো আপনার উপর থাকা মানুষের হক্ব তথা যাকাত সঠিকভাবে আদায় করেন, তাহলে আল্লাহ আপনাকে হঠাৎ কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেবেন কিংবা অন্য কোনো খাতে খরচ হওয়া থেকে রক্ষা করবেন। জীবনে এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলা আপনার যে টাকা খরচ করা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন সে টাকা বাড়ল না কমল, এবার একটু চিন্তা করুন তো?

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দরুন ঐ ১ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা খরচ হলে আপনার মোট টাকা কমে যদি অর্ধ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়ে যায়, তাহলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে আপনার রব আপনার ১ লক্ষ টাকা অক্ষত রাখায় কি টাকা কমল নাকি বাড়ল? নিশ্চয়ই এখানে ‘বৃদ্ধি’ হওয়ার স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। আর এটাকেই বলে বরকত। যাকাত দিলে মূলত আল্লাহ সম্পদে বরকত বাড়িয়ে দেন, যা হয়তো আপনি আপাতদৃষ্টিতে বুঝতেই পারছেন না।

মনে রাখবেন, যাকাত দিলে আপনার অনেক টাকা কমে যাচ্ছে ব্যাপারটি মোটেও তেমন নয়। আড়াই পার্সেন্ট করে হলে লাখে মাত্র আড়াই হাজার টাকা দিতে হয়, আই রিপিট মাত্র আড়াই হাজার। আর লাখের বিপরীতে এ অর্থ আহামরি কিছুই নয়। আল্লাহর আপনাকে এতো কিছু দেওয়ার বিপরীতে এ টাকা একেবারেই সামান্য। এ সামান্য টাকার যাকাত দিতে গড়িমসি করা রবের প্রতি বান্দার চরম অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আপনার কাছে মনে হতে পারে যে, যাকাত দেওয়ায় আপনার সম্পদ হয়তো কিছুটা কমেছে। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হলেও আসলে ঐ খরচ হয়ে যাওয়া সম্পদ মূলত আপনার হাত থেকে চলে গেছে আপনার জন্য আরও সম্পদ নিয়ে আসার জন্য তা আপনি একটু চিন্তা করলে বুঝতে সক্ষম হবেন। সেজন্য যাকাত দিতে আমাদের কোনোভাবেই কৃপণতা করলে চলবে না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরয বিধান। তাই এমন বিধান পালনে গড়িমসি করার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের উপর যাকাত ফরয হচ্ছে কিনা আর ফরয হয়ে থাকলে সঠিক পন্থায় তা আদায় করা হচ্ছে কিনা সেসব বিষয়ে খেয়াল রাখা অতি আবশ্যক।

* আম্বরখানা, সিলেট।

নারীদের পাতা

নারীর ছিয়াম: শরীআত ও বাস্তব দিকনির্দেশনা

-মো. আকরাম হোসেন*

রামাযান ইবাদতের বসন্তকাল। আত্মশুদ্ধি, সংযম ও আল্লাহভীতির অনুশীলনের জন্য এই মাস মহান রব আমাদের সামনে বিশেষ এক সুযোগ উন্মুক্ত করে দেন। একজন মুমিন নারীর জীবনে রামাযান কেবল সময়ের পরিবর্তন নয়; বরং দায়িত্ব, সংবেদনশীলতা ও সচেতনতার এক গভীর পাঠ। সংসার, সন্তান, কর্মজীবন ও সামাজিক বাস্তবতার ভেতর থেকেও কীভাবে শরীআতের আলোয় ছিয়াম আদায় করা যায়, এই লেখায় সে বিষয়গুলোই সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছিয়াম নিছক পানাহার বর্জনের নাম নয়; এটি চরিত্র নির্মাণের ইবাদত। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল গুনাহ থেকে বিরত থাকা, প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং নৈতিক উৎকর্ষ অর্জন করাই ছিয়ামের মৌলিক দাবি। মিথ্যা কথা, বেহুদা আলাপ, গীবত, চোগলখোরি, অশালীন আচরণ কিংবা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থেকেও যে ছিয়ামের পূর্ণতা আসে না, সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে না, তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।[১৫১] এই হাদীছ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ছিয়ামের সার্থকতা নিহিত আছে আত্মসংযম ও চরিত্র সংশোধনের মধ্যেই।

ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে ছিয়াম বাতিল হয়ে যায় এবং ক্বাযা আদায় করা ফরয হয়। তবে ভুলবশত খেলে বা পান করলে ছিয়ামের কোনো ক্ষতি হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন, ভুলে খাওয়া বা পান করা আল্লাহর পক্ষ থেকেই রিযিক্ব হিসেবে গণ্য হয়।[১৫২] অনুরূপভাবে, ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ছিয়াম নষ্ট হয়; কিন্তু অনিচ্ছাকৃত বমিতে ছিয়ামের কোনো সমস্যা নেই।[১৫৩]

নারীদের ক্ষেত্রে হায়েয ও নিফাস ছিয়ামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। বিদ্বানদের ঐকমত্য অনুযায়ী, এ অবস্থায় ছিয়াম শুদ্ধ নয়; বরং ছিয়াম রাখা নিষিদ্ধ। দিনের শেষভাগে হলেও হায়েয শুরু হলে ছিয়াম ভেঙে যাবে এবং পরে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে এ অবস্থায় ছালাতের ক্বাযা নেই। এটি ইসলামের পক্ষ থেকে নারীদের জন্য একটি বড় সহজীকরণ।[১৫৪]

সমাজে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা নারীদের অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তায় ফেলে। যেমন, নাপাক অবস্থায় সকাল হলে ছিয়াম শুদ্ধ হয় না—এই ধারণা ভিত্তিহীন। নবী ﷺ নিজে নাপাক অবস্থায় ফজর করেছেন, অতঃপর গোসল করে ছিয়াম পালন করেছেন।[১৫৫] তেমনি রান্নার প্রয়োজনে খাবারের স্বাদ দেখা জায়েয, যতক্ষণ তা কণ্ঠনালি অতিক্রম না করে।[১৫৬] প্রচণ্ড গরম বা পিপাসার কারণে মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢাললেও ছিয়ামের কোনো ক্ষতি হয় না। এ বিষয়ে নবী ﷺ-এর আমল প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান।[১৫৭]

ছিয়াম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক চুম্বন বৈধ, যদি উভয়ে নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হন এবং সহবাস বা বীর্যপাতের আশঙ্কা না থাকে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করতেন, অথচ তিনি ছিলেন নিজেকে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণকারী।[১৫৮] তবে যাদের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কা রয়েছে, তাদের জন্য এ অনুমতি প্রযোজ্য নয়।

বাকি অংশ ৩৭ নং পেজে...

* প্রভাষক (আরবী), পাঁচটিকরি আলিম মাদরাসা, ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

১৫১. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৩।
১৫২. ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৫।
১৫৩. আবূ দাঊদ, হা/২৩৮০, হাদীছ ছহীহ।
১৫৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫।
১৫৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৯২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১০৯।
১৫৬. ইবনে আবী শায়বা, ৩/৪৭।
১৫৭. আবূ দাঊদ, হা/২৩৪৮, হাদীছটি ছহীহ।
১৫৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৯২৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১১০৬।

জামি‘আহ পাতা

রামাযান: তাক্বওয়া নির্মাণের নববী কর্মশালা

-আদিল বিন ফোরকান*

ভূমিকা:

রামাযান কেবল একটি ইবাদতপূর্ণ মাস নয়; বরং এটি একজন মুমিনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি পরিকল্পিত প্রশিক্ষণকাল, যার লক্ষ্য তাক্বওয়া অর্জন, নফসের সংস্কার এবং ঈমানের পুনর্গঠন। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে সালাফে ছালেহীন রামাযানকে যেভাবে দেখেছেন, তা আজকের আবেগনির্ভর ও আচারকেন্দ্রিক রামাযান চর্চা থেকে অনেকটাই ভিন্ন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাক্বওয়াবান হতে পার’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

এই আয়াতেই রামাযানের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়েছে আর তা হলো তাক্বওয়া অর্জন। সালাফে ছালেহীন রামাযানকে কখনোই কেবল ‘ছিয়াম রাখার মাস’ হিসেবে দেখেননি; বরং তারা একে দেখেছেন তাক্বওয়া অর্জনের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া হিসেবে।

১. ছিয়াম: ক্ষুধার নাম নয়, নফসকে নিয়ন্ত্রণের নাম

সালাফদের কাছে ছিয়াম ছিল শুধু পানাহার বর্জন নয়; বরং তারা বিশ্বাস করতেন, যে ছিয়াম জিহ্বাকে সংযত করে না, চোখকে লজ্জাশীল করে না এবং অন্তরকে আল্লাহভীরু করে না, সে ছিয়াম তার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ করে না। জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَآثِمِ ‘তুমি যখন ছিয়াম রাখ, তখন যেন তোমার কান, চোখ ও জিহ্বাও ছিয়াম রাখে’।[১৬৫]

আজ আমরা অনেক সময় ছিয়ামকে একটি শারীরিক ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে ফেলি, অথচ সালাফদের কাছে এটি ছিল নৈতিক ও আত্মিক শুদ্ধতার একটি সামগ্রিক অনুশীলন।

২. কুরআন ও রামাযান: পাঠ নয়, আত্মসমর্পণ

রামাযান মানেই কুরআন, এটি একটি পরিচিত কথা। কিন্তু সালাফদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এখানেই যে, তারা কুরআন শেষ করার জন্য পড়তেন না, বরং নিজেকে কুরআনের সামনে সমর্পণ করার জন্য পড়তেন।

ইমাম ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন, وَكَانَ مَالِكٌ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ يَفِرُّ مِنْ قِرَاءَةِ الْحَدِيثِ وَمُجَالَسَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَقْبَلَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُصْحَفِ অর্থাৎ ‘ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ যখন রামাযান আসত, তখন হাদীছ পাঠ ও আলেমদের মজলিস ছেড়ে দিতেন এবং মুছহাফ থেকে কুরআন তেলাওয়াতে মনোনিবেশ করতেন। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ রামাযান এলে হাদীছের দারস বন্ধ করে দিতেন এবং বলতেন, এটি কুরআনের মাস’।[১৬৬]

তাদের কুরআন তেলাওয়াত ছিল ধীর, গভীর ও চিন্তাশীল। প্রতিটি আয়াত তাদের আমলকে বদলে দিত, চরিত্রকে গড়ে তুলত। আর আজ আমাদের তেলাওয়াতের গতি বেড়েছে, কিন্তু কুরআনের প্রভাব কমে গেছে। এই বাস্তবতা আমাদের আত্মসমালোচনার দাবি রাখে।

৩. ইখলাছ: রামাযানের অদৃশ্য আমল

সালাফী মানহাজের অন্যতম মূলনীতি হলো ইখলাছ অর্থাৎ সব আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। রামাযান এই ইখলাছ পরীক্ষার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। কারণ ছিয়াম এমন একটি ইবাদত, যা লোকচক্ষুর আড়ালে পালন করা যায়। তাই হাদীছে কুদসীতে এসেছে, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ‘আল্লাহ তাআলা বলেন, ছিয়াম আমার জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দিব’।[১৬৭]

---

* শিক্ষার্থী, ৯ম শ্রেণি, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১৬৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ‘কিতাবুছ ছিয়াম’, ২/৪২২; বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/৩৫৭৫।

১৬৬. ইবনু রজব আল-হাম্বলী, লাতায়িফুল মাআরিফ, একই বক্তব্য সালাফদের রামাযান-আমল হিসেবে অন্যান্য কিতাবেও অর্থগতভাবে এসেছে, তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হলো লাতায়িফুল মাআরিফ।

১৬৭. ছহীহ বুখারী, ‘কিতাবুছ ছওম’, হা/১৯০৪; ছহীহ মুসলিম, ‘কিতাবুছ ছিয়াম’, হা/১১৫১।

www.al-itisam.com

সালাফরা রামাযানে লোকদেখানো আমল থেকে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতেন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষের সন্তুষ্টি নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

৪. ক্বিয়ামুল লায়ল ও আত্মসংলাপ:

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ সালাফদের কাছে বিনোদন ছিল না, বরং তা ছিল নিজের নফসের সঙ্গে গভীর আত্মসংলাপের সময়। দীর্ঘ কিয়ামে তারা নিজেদের গুনাহ স্মরণ করতেন, আখেরাতের ভয় অনুভব করতেন এবং আল্লাহর সামনে ভেঙে পড়তেন।

আজকের দ্রুতগতির তারাবীহ আমাদের শরীরকে ক্লান্ত করে, কিন্তু হৃদয়কে নাড়া দেয় না। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

৫. ঈদের পরে রামাযান টিকে থাকে কি?

সালাফদের দৃষ্টিতে রামাযানের সাফল্য নির্ধারিত হতো ঈদের পরেও একজন মানুষের আমল কেমন থাকে তার মাধ্যমে। কারণ সত্যিকারের রামাযান মানুষকে বদলে দেয়। হাসান আল-বাছরী رحمه الله বলেন, إِنَّ مِنْ عَلَامَةِ قَبُولِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا، وَإِنَّ مِنْ عُقُوبَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ بَعْدَهَا অর্থাৎ ‘আল্লাহ কোনো বান্দার রামাযান কবুল করলে তিনি তাকে তার পরেও নেক আমলের তাওফীক্ব দেন’।[১৬৮]

অতএব, যে রামাযান শুধু ক্যালেন্ডারে আসে ও যায়; কিন্তু জীবনে পরিবর্তন আনে না, সে রামাযান নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবা দরকার।

উপসংহার:

রামাযান কোনো সংস্কৃতি নয়, কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি নববী পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা তাক্বওয়ার মাসব্যাপী কর্মশালা। সালাফে ছালেহীনের মানহাজ আমাদের শেখায় যে, রামাযানকে কেবল ক্যালেন্ডারের একটি মাস হিসেবে নয়; বরং অনুভবে, আমলে ও চরিত্রে গভীরভাবে ধারণ করতে হবে।

আসুন! আমরা রামাযানকে শুধু পালন না করে নিজেদের পুনর্গঠনের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করি। কারণ রামাযান আসে প্রতি বছর, কিন্তু আমরা যে বেঁচে থাকব এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

১৬৮. ইবনু রজব আল-হাম্বলী, লাতায়িফুল মাআরিফ, রামাযান পরবর্তী আমল প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু রজব رحمه الله হাসান আল-বসরী رحمه الله -এর এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন; আবূ নুআইম আল-ইসফাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১৪৭।

নারীর ছিয়াম: বাকি অংশ

ব্রাশ করা নিয়েও নারীদের মধ্যে দ্বিধা দেখা যায়। খাদ্যনালিতে কিছু প্রবেশ না করলে ছিয়াম অবস্থায় ব্রাশ করা জায়েয। তবে সন্দেহ এড়ানোর জন্য দিনে ব্রাশ না করাই অধিক সতর্কতা।[১৫৯]

অতি বৃদ্ধা নারী কিংবা এমন রোগী, যাদের সুস্থ হওয়ার আশা নেই, তাদের জন্য ছিয়াম ফরয নয়। এ ক্ষেত্রে ক্বাযাও আদায় করতে হবে না; বরং প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে।[১৬০] গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীর ক্ষেত্রে নিজের বা সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে ছিয়াম না রাখার অনুমতি রয়েছে। পরবর্তীতে সেই দিনগুলোর ক্বাযা আদায় করতে হবে।[১৬১]

হায়েয বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ওষুধ সেবনের মাধ্যমে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে এবং এতে কোনো শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে ছিয়াম শুদ্ধ হবে। তবে ছাহাবী যুগে এ ধরনের চর্চা না থাকায় এবং শরীরের স্বাভাবিকতার প্রতি সম্মান রেখে এ কাজ পরিহার করাই উত্তম বলে আলেমগণ মত দিয়েছেন।[১৬২]

অনিয়মিত বা দীর্ঘস্থায়ী রক্তপাতের ক্ষেত্রে যদি তা হায়েয হিসেবে চিহ্নিত না হয়, তবে সেটি ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। সে অবস্থায় নারী ছিয়াম ও ছালাত আদায় অব্যাহত রাখবে এবং কেবল অভ্যাসগত হায়েযের দিনগুলোতেই বিরত থাকবে।[১৬৩]

পরিশেষে বলা যায়, ছিয়াম নারীদের জন্য কোনো কঠিন বোঝা নয়; বরং এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমতপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ এক বিধান। সঠিক জ্ঞান ও সচেতনতা থাকলে একজন নারী সংসার ও সমাজের দায়িত্ব পালনের মাঝেও পূর্ণ আত্মিক প্রশান্তির সাথে ছিয়াম আদায় করতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ছহীহ বুঝ ও আন্তরিকতার সাথে ছিয়াম পালনের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১৫৯. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/১১৭।
১৬০. সূরা আল-বাক্বারা, ২/১৮৪; ছহীহ বুখারী, হা/৪৫০৫; আল-মুগনী, ৪/৩৯৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ১১/১৬৪।
১৬১. ইবনু মাজাহ, হা/১৬৬৭; মুসনাদ আহমাদ ৪/৩৪৭; মাজমূ‘ ফাতাওয়া শায়খ বিন বায, ১৫/২২৭।
১৬২. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/১২৮; ইবনু উছায়মীন رحمه الله, হায়েয ও নিফাসের বিধান সংক্রান্ত ৯০টি ফতওয়া।
১৬৩. ইবনু উছায়মীন رحمه الله, হায়েয ও নিফাসের বিধান সংক্রান্ত ৯০টি ফতওয়া।

হেলথ কর্নার

রামাযানে পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস: সুস্থভাবে ছিয়াম পালনের উপায়

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

রামাযান মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বরকতময় মাস। এ মাসে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করা হয়। ছিয়াম শুধু ইবাদতই নয়; সঠিকভাবে পালন করলে এটি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। এতে হজমশক্তি উন্নত হয়, অতিরিক্ত চর্বি কমে এবং ধৈর্য ও আত্মসংযম বৃদ্ধি পায়। তবে অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসে দুর্বলতা, অ্যাসিডিটি বা হজমের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই রামাযানে খাবারের ধরন, পরিমাণ ও সময়ের প্রতি সচেতন থাকা জরুরী।

রামাযানে খাবারের সময়:

রামাযানে সাহরী ও ইফতার—এই দুই সময়ের খাবারই মূল। এ সময় সঠিক খাবার গ্রহণ করলে সারাদিন শরীর শক্তি ও সতেজতা ধরে রাখতে পারে।

ইফতারে স্বাস্থ্যকর খাবার:

সারাদিন ছিয়ামের পর ইফতারে সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

- খেজুর ও পানি দিয়ে ইফতার শুরু করা উত্তম।
- মৌসুমি ফল, ফলের রস, দই, ছোলা, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি হালকা খাবার শরীরের জন্য উপকারী।
- ভাজাপোড়া ও অতিরিক্ত মিষ্টি কম খাওয়া ভালো, কারণ এগুলো হজমে সমস্যা ও ওযন বৃদ্ধি করতে পারে।

সাহরীতে কী খাবেন:

সাহরী দীর্ঘ সময়ের ছিয়ামের জন্য শক্তি জোগায়, তাই পুষ্টিকর খাবার বেছে নেওয়া দরকার।

- শস্যদানা, নন-রিফাইনড আটা, ঢেঁকিছাঁটা চালের মতো কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট দীর্ঘ সময় শক্তি দেয়।
- মাছ, মাংস, ডিম বা ডাল প্রোটিনের ভালো উৎস।
- সবজি ও আঁশযুক্ত ফল হজমে সহায়ক এবং শরীরকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন দেয়।
- চা বা ক্যাফেইনজাতীয় পানীয় কম গ্রহণ করা উচিত, কারণ এগুলো শরীর থেকে পানি কমিয়ে দেয়।

পানি ও বিশ্রামের গুরুত্ব:

দীর্ঘ সময় উপবাসে শরীরে পানির ঘাটতি তৈরি হতে পারে।

- সাহরীর পর ৩–৪ গ্লাস পানি পান করুন।
- ইফতার থেকে সাহরী পর্যন্ত ধীরে ধীরে ৭–৮ গ্লাস পানি গ্রহণ করা ভালো। পর্যাপ্ত পানি ডিহাইড্রেশন ও কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় এবং শরীরকে সতেজ রাখে।একই সঙ্গে প্রতিদিন ৫–৭ ঘণ্টা ঘুম শরীরকে কর্মক্ষম রাখে এবং ছিয়াম পালন সহজ করে।

স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে করণীয়:

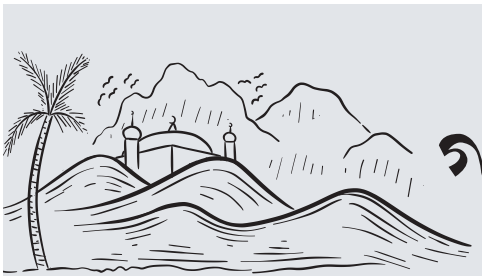
উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগ থাকলে ছিয়াম রাখার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরী। প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাস ও ওষুধের মাত্রা সমন্বয় করতে হবে।

স্বাস্থ্যকর ছিয়ামের মূল নির্দেশনা:

- খাবারের পরিমাণ পরিমিত রাখা।
- ভাজাপোড়া ও অতিমিষ্টি কম খাওয়া।
- পর্যাপ্ত পানি পান করা।
- প্রোটিন ও কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটসমৃদ্ধ খাবার নির্বাচন।
- পর্যাপ্ত ঘুম ও মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখা।

সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও নিয়ম মেনে ছিয়াম রাখলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। এতে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পাশাপাশি জীবনে শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও ইতিবাচকতা গড়ে ওঠে। সুস্থ ও সচেতনভাবে ছিয়াম পালন করলে রামাযান হয়ে উঠতে পারে আত্মশুদ্ধি ও সুস্থ জীবনের এক অনন্য সুযোগ।

* চিকিৎসক, কলাম লেখক ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।



গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান



সাদা পাঞ্জাবী

-মাজহারুল ইসলাম আবির*

[১]

গ্রামের মাঝ বরাবর ইট বিছানো যে আধাপাকা রাস্তাটা গেছে, সে রাস্তা দিয়ে প্রভাতের মিইয়ে আসা সুনসান আঁধারে হেঁটে চলেছে পাঞ্জাবী-টুপি পরা একদল ছোট হুজুর। পুরো রাত টুপটাপ করে ঝরা শিশিরবিন্দু গাছের পাতায় মাকড়সার জাল হয়ে ছেয়ে আছে। তখনও যেন পুরো গ্রাম ঘুমিয়ে আছে। রাস্তার পাশের বাড়িগুলো থেকে হাঁড়িপাতিলের শব্দ আসছে। হয়তো রান্না বসিয়ে দিয়েছে বাড়ির গৃহিণীরা। বাড়িঘরের বৈদ্যুতিক লাইটের হালকা আলো এসে মিলেছে শেষরাতের চাঁদের আবছা রোশনাইয়ের সাথে। এই নিস্তব্ধতায় হাঁটার আওয়াজ পিছনে ফেলে এগিয়ে চলছে আমিনপুর হাফিযিয়া ইয়াতীমখানা মাদরাসার ছোট বাচ্চারা। তারা যে যার জাইগির বাড়িতে যাচ্ছে। পুরো বছর তারা মাদরাসাতেই খায়। শুধু রামাযানের এই বরকতময় মাসে গ্রামের লোকেরা ছওয়াবের আশায় একেকজন ইয়াতীম ছাত্রকে নিজের বাড়িতে খাওয়ায়। হুযায়ফা তেমনই এক ইয়াতীম বালক। বছর দুয়েক আগে সে এই মাদরাসায় এসেছে। পৃথিবীতে আসার আগেই সে তার বাবাকে হারিয়েছে। অভাগী মায়ের কোলে অভাবের সংসারে বাবার ছায়াহীনতার মাঝেই বড় হয়েছে সে। এরপর তার ঠিকানা হয়েছে এই হাফিযিয়া ইয়াতীমখানা মাদরাসায়। এখানেই তার দিনের পর দিন কাটে, মাসের পর মাস। রামাযান শেষে সে এখানেই তার মতো অসহায়দের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে।

[২]

হুযায়ফা সাহারী খেতে বসেছে। পাশে বসেছেন নিম্নমধ্যবিত্ত এই বাড়ির কর্তা আনোয়ারুল হক। ভাত বেড়ে দিচ্ছেন তার স্ত্রী ছানোয়ারা বেগম। হুযায়ফার পাতে তুলে দিলেন বড় মাছের মাথা। হুযায়ফা তাদেরকে দাদা-দাদি বলে ডাকে। আর তারা হুযায়ফাকে ডাকে ‘বাবা’ বলে। রামাযানের দুই দশকের পরিচয়ে এতটা আপন হয়ে গেছে তারা, মাঝেমধ্যে ইফতারের পর আনোয়ারুল হক তাকে চা খেতে নিয়ে যায় বাজারে। হুযায়ফা রাতের খাবার ও সাহারী খায় এ বাড়িতে আর ইফতার করে গ্রামের মসজিদে। এ গ্রামের মসজিদে রোজ ইফতারির ব্যবস্থা আছে। গ্রামের প্রতিটি পরিবার এই ৩০ দিন পালাক্রমে ইফতারি দেয়। ছোট থেকে বড় সবাই শেষ বিকেলে সারিতে বসে যায় মসজিদের সামনের বারান্দায়। দুয়েকজন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকের ঝুলিতেও খাবার জোটে এখানে। ইফতার বিতরণ শেষে কিছু বৃদ্ধ সেখানেই বসে ইফতারি করেন। ছোটরা ইফতার নিয়ে চলে যায় আপন বাড়িতে। এরপর মা-বোনদের সাথে মিলে ইফতারে বসে। আযানের আগেই চুপিচুপি মুখে পিঁয়াজু নিয়ে চিবাতে থাকে। তরুণরা মসজিদ থেকে ইফতার নিয়ে দলে দলে গোল হয়ে বসে পড়ে বিভিন্ন দোকানের টংয়ে। গ্রামের কিছু মানুষ বাজার করতে গিয়ে সময় শেষ হওয়ায় সেখানেই কোথাও ইফতার সেরে নেয়। বাড়ির মহিলারা প্লেট সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকে আযানের অপেক্ষার। মসজিদের মুয়াযযিন সাহেব খেজুর হাতে ঘড়ি দেখেন বারবার। সময় হলে মাইকে ফুঁ দিয়ে শুরু করেন ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’। এরপর সারাদিনের পিপাসার্ত গলা ভিজিয়ে দেয় ইফতারের সুখ। দিনশেষে এতেই তো ছিয়াম পালনকারীর তৃপ্তি। আর সাথে আল্লাহর প্রতিশ্রুত অফুরন্ত প্রতিদান তো আছেই।

[৩]

ঈদ মানে আনন্দ-উল্লাসের আমেজ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মনোনীত এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর ঘোষিত আনন্দের দিন। খুশির আভাসের সুবাস ছড়িয়ে যায় গ্রাম-গঞ্জের অলিগলিতে। কত আনন্দ, কত প্রস্তুতি আর ছেলেমেয়েদের নতুন পোশাকের বায়না। তাদের আছে চশমা, ঘড়ি, জুতার শখ আর স্বজনদের কাছে সালামীর আবদার। বাসা-বাড়িতে হরেক প্রকারের সেমাই, আত্মীয়দের বাড়িতে দাওয়াত, দূরের মানুষদের আপন ঘরে ফেরা তো আছেই। রামাযান যতই শেষ হয়, ততই বাড়তে থাকে ঈদের কেনাকাটা আর আনন্দের

* শিক্ষার্থী, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

www.al-itisam.com

আয়োজন। একদিকে রামাযানের বিদায়ের দুঃখ, অপরদিকে ঈদের সুখ, এ দুই মিলিয়ে মুমিনের মন মিশ্র অনুভূতিতে ভরে ওঠে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা মার্কেট করে ঈদের নতুন চকচকে পোশাকটি লুকিয়ে রাখে, কাউকে দেখায় না। যদি কোনো বন্ধু-বান্ধব তার মতো ডিজাইনের কাপড় কিনে ফেলে! কোনো কোনো পরিবারের সদস্যরা কিংবা বন্ধুরা একই রকম পাঞ্জাবী বানায়। আকাশে-বাতাসে ইসলামের সুখবার্তা ভাসতে থাকে। কিন্তু! কিন্তু নতুন পোশাক তো দূরে থাক, যাদের পরনের কাপড়েই কয়েকটা জোড়াতালি, যাদের রাত কাটে স্টেশনে বস্তা গায়ে জড়িয়ে, ঈদগাহে গিয়েও যাদের পথের পাশে হাত পেতে পড়ে থাকতে হয় দুটো টাকার আশায়— তাদের কাছে ঈদের দিনে চেয়ে পাওয়া এক বাটি সেমাইয়ে-ই ঈদের সুখ। হুযায়ফার আছে দুই বছরের পুরনো দুটো পাঞ্জাবী মাত্র। সে দুটো এখন ছোট হয়ে এসেছে। পকেটের সেলাই সেই কবেই খুলে গেছে। বুকের বোতাম নেই দুই-তিনটা। সাদা পাঞ্জাবী ময়লা লেগে লেগে ধবধবে রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। গ্রামের রাস্তার পাশে মাদরাসার যে ভাঙা দেয়ালটা আছে, সেটাতে বসে হুযায়ফা চেয়ে থাকে গ্রামের ছেলেমেয়েরা ঈদের মার্কেট করে বাইকে করে বাড়ি ফিরে। বাবা বেঁচে থাকলে সেও হয়তো বাবার হাত ধরে মার্কেট করতে যেত! তারও তো শখ হয়, ঈদের ছালাতে নতুন পাঞ্জাবী পরবে। মা নিজ হাতে মাথায় পরিয়ে দিবেন সাদা সুন্দর টুপি! দাদি সুরমা লাগিয়ে দিবেন চোখের পাতায়। এরপর সে বাবা ও দাদার সাথে ঈদগাহে যাবে। ছালাত শেষে বাবার থেকে টাকা নিয়ে দানের কৌটায় দিবে! সে এমন ভাবনা ভাবে আর নিভৃতে ব্যথিত হয়। সে জানে, এসব সুখ তার জন্য নয়। গরীবের এসব ভাবতে নেই। তাই সে যা আছে তা দিয়েই ঈদের প্ল্যান করতে থাকে। একটি পাঞ্জাবী ধুয়ে গুছিয়ে রাখে দড়িতে। ঈদের ছালাতে বন্ধুদের সাথে একসাথে হেঁটে যাবে। মাদরাসায় যে সেমাই আসবে সেগুলো সবাই মিলে রান্না করবে। গ্রামের পাশের বনে আর নদীতে বিকেলে ঘুরতে বের হবে। এতেই এই ইয়াতীম ছাত্রদের ঈদ!

[৪]

হুযায়ফা খেতে বসলে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন ছানোয়ারা বেগম। নিজ পেটের বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে যায় তখন, যে কলিজার টুকরা জন্মের পরেই মারা গিয়েছিল। হুযায়ফার চেহারায় যেন তিনি হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে খুঁজে পান। ভীষণ মায়া হয় তার জন্য। মুনাজাতে হুযায়ফার জন্য দু'আ চলে আসে আনমনেই। হাতের নতুন সাদা সুন্দর পাঞ্জাবীটা হুযায়ফার জন্যই। আনোয়ারুল হক ঈদের মার্কেট করতে গিয়েছিলেন। ছানোয়ারা বেগম ড্রয়ার খুলে নিজের জমানো কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন স্বামীর হাতে।

-হুযায়ফার জন্য একখান পাঞ্জাবী লই আইও। বাচ্চাটার ভালা পাঞ্জাবী নাই!

-(মুখে হাসি নিয়ে আনোয়ার বলেন) মনের কথা কইছো। মুইও তো হেইডা ভাবতাসিলাম। এই ট্যাকা রাখো। মুই নিমু, ইনশা-আল্লাহ!

-না। এইডাই দিয়া নিও। আমার ভালা লাগবো। আর শোনো, সাদা রঙের পাঞ্জাবী নিও।

আনোয়ারুল হক মার্কেটে গিয়ে সবার আগে হুযায়ফার জন্য পছন্দ করে পাঞ্জাবী কিনলেন। এরপর নিজের একটা লুঙ্গি আর স্ত্রীর জন্য কাপড় কিনে বাড়িতে ফিরলেন। ছানোয়ারা বেগম পাঞ্জাবীটি গুছিয়ে আলনাতে সাজিয়ে রাখলেন। ঈদের এখনও পাঁচদিন বাকি। এখন না, বরং চাঁদরাতে পাঞ্জাবীটা হুযায়ফার হাতে দিবেন তিনি। এতে সে অনেক বেশি অবাক হবে। হাতে নতুন পাঞ্জাবী পেয়ে মুচকি হাসি খেলে যাবে তার চোখেমুখে। এই হাসিটাই তো ছানোয়ারা বেগম দেখতে চান।

[৫]

শেষ ছিয়ামের মাগরিব পর মসজিদ থেকে বের হয়ে গ্রামের সবাই চতুর দৃষ্টিতে তাকায় পশ্চিম দিগন্তে। ঈদের চাঁদ বাঁকা ঠোঁটে হেসে ওঠে সবুজ পাতার আড়ালে। যে প্রথমে দেখতে পায়, হাতের ইশারায় দেখাতে চেষ্টা করে বাকিদের। ছোটরা তাদের দীপ্তিময় চোখের তারায় চাঁদ দেখে খুশিতে লাফিয়ে ওঠে। জ্যোতি কমে যাওয়া বৃদ্ধরাও চোখের উপরে হাত দিয়ে চাঁদের দেখা পেতে উদগ্রীব হন। ছেলেরা দল ধরে বেরিয়ে পড়ে চাঁদরাতের আলোতে। মেয়েরা মেহেদীতে রাঙিয়ে তোলে নিজের হাত। আকাশে-বাতাসে শুধু আনন্দের সমারোহ। হুযায়ফার জন্যও হয়তো এবারের ঈদ আনন্দের হবে। ছানোয়ারা বেগম যখন তার হাতে নতুন সাদা পাঞ্জাবী তুলে দিবেন, তখন হয়তো সে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। ঈদের দিন হয়তো তাকে এ বাড়িতেই খাওয়াবেন আনোয়ারুল হক। সাদা পাঞ্জাবীটা সে বারবার ভাঁজ খুলে খুলে দেখবে। ঈদের ছালাতে নতুন এই জামা পরে মুছল্লায় যাবে। তারপরও কোথাও যেন একটা চাপা শূন্যতা থেকে যাবে তার। চাঁদরাতে উঠানে বসে মরা বাপ আর অভাগিনী মায়ের কথা মনে পড়বে তার। সাময়িক সুখে কি চিরন্তন দুঃখ ঢাকা যায়? আর তার মতো যারা আছে এই ইয়াতীমখানা মাদরাসায়, তাদের ঈদ হয়তো আগের মতোই পুরাতন ছেঁড়া পাঞ্জাবীতেই কাটবে। যাদের রাত কাটে পথের পাশে, তাদের ঈদ হয়তো সেখানেই হবে খোলা আসমানের নিচে ভিজে! যেসব পথশিশু বোতল কুড়িয়ে বেড়ায়, তাদের ঈদ কত অসুখে কাটবে! এই পৃথিবীতে সুখের হাওয়া বইলেও কোথাও কেউ নিদারুণভাবে থেকে যায় ভীষণ অসুখে। ঈদের চাঁদ সারা পৃথিবীতে আলো ছড়িয়ে দিলেও সবার ঈদ পূর্ণতা পায় না আর সবার ঘরে ঈদও আসে না!

www.al-itisam.com

কবিতা

রামাযানের ডাক

-আব্দুল ওয়াদুদ বিন আবূ বকর
শিক্ষার্থী, আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

রামাযানে নেমে আসে রহমতের আলো,
নফসের অন্ধকারে জাগে তাক্বওয়ার ভালো।
ছিয়ামের শপথে জাগে আত্মশুদ্ধির গান,
ক্ষুধার মাঝে শেখায় ছবর, শেখায় ঈমান।
ভোরের আযানে নাচে নিদ্রাভরা মন,
রবের ডাকে জেগে ওঠে বিশ্বাসী জনগণ।
দিনভর তৃষ্ণায় পুড়ে নীরব প্রার্থনা,
রবের নৈকট্যে ঝরে পড়ে গুনাহের আবর্জনা।
সূর্য ঢলতেই খোলে দোয়ার আকাশ,
ইফতারের মুহূর্তে নামে কবুলের প্রকাশ।
এক ফোঁটা পানি, এক খেজুরের তৃপ্তি,
শিখিয়ে দেয় কৃতজ্ঞতা, শেখায় বিনয়ী ভক্তি।
রামাযান শেখায়, সবকিছু ছেড়ে দাও,
অন্যায় অহংকার থেকে নিজেকে বাঁচাও।
রাত নামে, তারাবীর সুরে কাঁদে সিনা,
কুরআনের আলোয় জ্বলে উঠে হৃদয়-দীপশিখা।
লায়লাতুল ক্বদরে ঝরে নূরের ধারা,
এক রাতেই বদলে যায় হাজার মাসের হারা।
শেষ প্রহরে মিনতি ওঠে কাঁপা স্বরে,
হে রব! মাফ করো—চোখ ভিজে যায় জলে।
রামাযান যায়, রেখে যায় হেদায়াতের পথ,
ছিয়ামের শিক্ষা হোক সারা জীবনের ব্রত।

তুহফায়ে রামাযান

-হাফেয আব্দুর রহমান বিন জাহাঙ্গীর
বাউসা হেদাতী পাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

মাথার উপর নীল আকাশে চাঁদ উঠেছে ঐ,
আসছে রামাযান! ভাই-বোনেরা কই রে তোরা কই।
ইবাদতেরই দাওয়াত আমি দিচ্ছি তোদের ভাই,
আমল না করলে আসলে কোনোই ফায়দা নাই।
পড়বি ছালাত রাখবি ছিয়াম করবি ইবাদত,
সারা দিনই থাকবেরে তোর আল্লাহর রহমত।
আল্লাহরই কাছে মোরা যতবারই চাই,
তিনি দিতে রাজি আর খুশি সর্বদাই।

ছিয়ামের অনলে

-আনিছুর রহমান
তেঁতুল-তলা, বগুড়া।

ছিয়ামের অনলে পুড়ে যাক পাপরাশি,
দোযখের দ্বার বন্ধ আজ জান্নাতের কাজ করি ধরাবাসী।
লোভ-মোহ, কামনা-বাসনার চাই অবসান,
সব পাপ হোক ভস্ম এই করি আহ্বান।
নেকীগুলো জমা হোক, জান্নাত যেন পাই,
ছিয়ামের অনলে সব পুড়ে হোক ছাই।
বোমা-বারুদে শিশুরা নাহি যেন মরে,
ক্ষমতার জোরে দেশ দখল নাহি করে।
ফিলিস্তীনে মুসলিম স্বাধীনতা যেন পায়,
চীন-ভারতের মুসলিম রবের ইবাদত করে যায়।
সূদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, ধূমপান আর নয়,
ছিয়ামের অনলে সব যেন পুড়ে যায়।
কুরআন পড়ি, পড়ি তারাবীহ ছালাত,
দান করি, ফেতরা দেই, দেই ছাদাক্বা-যাকাত।
ভালোবাসি গরীব-অসহায় যারা,
ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ দূর করি মোরা।
কবুল করো ছিয়াম মোদের,
গুনাহগুলো ক্ষমা করো আমাদের।

লায়লাতুল ক্বদর

-রমজান বিন শামসুল
খাগুরিয়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

হাজার মাসের নেকী যদি লুটে নিতে চাও,
রামাযানের শেষ বেজোড় রাতে তালাশ করে নাও।
এই রাতে নফল ছালাত যত পড়তে পার,
নিয়্যত করো আজ থেকে নেকীর পাহাড় গড়।
সুরে সুরে মুখর হবে কুরআন তেলাওয়াত,
রহমতের দিশা পেতে জাগবে সারা রাত।
গুনাহ মাফের শ্রেষ্ঠ রাত এই রজনি,
ঈমানের সুরে জাগুক মোদের হৃদয়খানি।
লায়লাতুল ক্বদর—হয়ে গেছে অমর,
এই রাতে ফেরেশতা নামে ধরনি প্রান্তর।
লায়লাতুল ক্বদরে নাযিল কুরআনুল কারীম,
তাইতো এই রাতটি পেল সম্মানের তা'যীম।

www.al-itisam.com

ঈদ এলো

-মুহাম্মাদ সিরাজ উদ্দীন
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

বছর ঘুরে ঈদ এলো—ঈদ এলো ভাইরে,
গাঁ-শহরে ছোট-বড়োর খুশির সীমা নাইরে।
ঈদের দিনে সবাই মিলে ফিরনি-সেমাই খাবে,
ফিরনি-সেমাই খেয়ে সবাই ঈদের মাঠে যাবে।
বন্ধু-স্বজন সবার সাথে করবে কুশলাদি,
আগের দিনের দুঃখ-ব্যথা যাবে সবই ভুলি।
এক কাতারে শামিল হয়ে পড়বে ছালাত সবে,
ধনী-গরীব সবার মাঝে ঈদ আনন্দ রবে।

ঈদ সালামী

-সৈয়দ ইসমাইল হোসেন জনি
পশ্চিম বিন্নাপাড়া, দেউলকাঠি, ঝালকাঠি।

ঈদ সেলামী পাবার জন্য আপনজনের কাছে,
ছোট বেলায় হতাম হন্যে ঘুরতাম আশেপাশে।
আদর করে সালামী দিত আমার আপন লোকে,
কেউবা আবার কোলে নিত চুমু দিত দুই চোখে।
নতুন পোশাক গায়ে পরে করতাম ছুটোছুটি,
মামা চাচাকে জড়িয়ে ধরে কত কিযে খুনসুটি?
সালাম দিলেই টাকা দিয়ে বুকে টেনে নিত সবে,
হৃদয়ভরা আনন্দ নিয়ে মাততাম কলরবে।
নতুন নোটের মৌ মৌ গন্ধে খুশির দোলা লাগত,
ঈদ সালামীর সে আনন্দে অনেক স্বপ্ন জাগত।
হাসি দিতাম খুশির চোটে কী বর্ণনা দিব আমি?
স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে খুশির ঈদ সালামী।

ঈদ আসেনি

-শাহিন ইসলাম
দি রিয়েল হোমিও ক্লিনিক,
৩৫৭/বি মধুবাগ মগবাজার ঢাকা-১২১৭।

দেশটা যে আজ বড্ড কাতর
শোক-বিরহের ধুল-লাশে,
কেমনে বলো ঈদ নিয়ে আজ
উঠব মেতে উল্লাসে?
কষ্টে ভরা হৃদয় নিয়ে
চাঁদ দেখেছে ওরা কি?
আজকে যারা সর্বহারা
যার ঘরে নেই খোরাকি!
ওই যে দেখো ফুটপাতে সব
নিঃস্ব-নীরব চাহনি,
তাদের কাছে ঈদ মানে তো
ক্ষুধার জ্বালা দাহনই।
নষ্ট বিবেক বন্ধু তোমার
অন্তরে প্রেম চাষেনি,
যতই বলো ঈদ মোবারক
ওদের তো ঈদ আসেনি।

শাওয়ালের বাঁকা হাসি

-বাসসাম ইবনে আব্দুল আলীম
৭ম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

এক ফালি চাঁদ হেসেছে পশ্চিমের ঐ নীল গগণে
খুশির জোয়ার লাগল দেখে মুমিনদের এই মননে।
বিদায় নিচ্ছে মাহে রামাযান, রহমতের এক মাস
চোখের কোণে অশ্রু তবু মুখে হাসির আভাস।
দীর্ঘ মাসের ছিয়াম সাধনা, ইফতার, সাহরী
তারাবীর ঐ মধুর সুরে কাটল বিভাবরী।
সংযমের এই পরীক্ষা শেষে এলো খুশির দিন,
শাওয়ালের ঐ বাঁকা চাঁদে বাজল খুশির বীণ।
আজকে ভোলো বিভেদ সব, ধনী-গরীব ভাই
এক কাতারে দাঁড়িয়ে আজ প্রভুর করুণা চাই।
সেমাই, পায়েস, পোলাও আর আতরের ঐ ঘ্রাণ
বাতাস জুড়ে বইছে আজ খুশির কলতান।
পুরনো সব বিভেদ ভুলে মিলাও হাতে হাত
ভ্রাতৃত্ব থাকুক অটুট, হিংসা যাক নিপাত।
ভালোবাসা আর সম্প্রীতি মহান রবের দান,
সবার তরে ছড়িয়ে দাও আনন্দ অম্লান।
পবিত্র এই শিক্ষা যেন সারা বছর রয়
ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক বিশ্বজুড়ে বয়।

সংবাদ

বাংলাদেশ সংবাদ

ইমাম-মুয়াজ্জিনদের গ্রেড ও বেতন নির্ধারণ করল সরকার

সরকার সারা দেশের মসজিদগুলোর জনবল কাঠামো শক্তিশালী করতে এবং ইমাম-মুয়াজ্জিনদের দীর্ঘদিনের বেতন বৈষম্য দূর করতে নতুন নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারি গেজেটে (সোমবার, ১৯ জানুয়ারি) মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমদের জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫-এর আওতায় বিভিন্ন গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি কমিটি আলেম-উলামা ও ইমাম-খতিব সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে নীতিমালাটি প্রস্তুত করে। এতে খতিব ছাড়া অন্যান্য জনবলের গ্রেডভিত্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। খতিবের বেতন চুক্তিপত্র অনুযায়ী হবে এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও পাঞ্জেগানা মসজিদগুলোকে সামর্থ্য অনুযায়ী বেতন-ভাতা নির্ধারণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গেজেট অনুযায়ী গ্রেডগুলো হলো— সিনিয়র পেশ ইমাম ৫ম, পেশ ইমাম ৬ষ্ঠ, ইমাম ৯ম, প্রধান মুয়াজ্জিন ১০ম ও সাধারণ মুয়াজ্জিন ১১তম গ্রেড। প্রধান খাদেম ১৫তম ও সাধারণ খাদেম ১৬তম গ্রেড। এছাড়া নিরাপত্তা প্রহরী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য ২০তম গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

পানি দেউলিয়ার যুগে প্রবেশ করেছে বিশ্ব : জাতিসংঘের সতর্কবার্তা

জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (ইউএনইউ)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ব এখন ‘পানি দেউলিয়া’ হওয়ার যুগে প্রবেশ করেছে। এটি সাধারণ পানি সংকট নয়; বরং অতিরিক্ত স্বাদুপানি উত্তোলনের কারণে নদী, হ্রদ, ভূগর্ভস্থ জলাধার, হিমবাহ ও জলাভূমি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যা অনেক ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারযোগ্য নয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, সমাজগুলো বৃষ্টিপাত ও তুষার গলন থেকে বার্ষিক যত পানি পায়, তার চেয়েও বেশি ব্যবহার করছে; ফলে দীর্ঘমেয়াদি মজুদও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বের অর্ধেকের বেশি বড় হ্রদ সংকুচিত হচ্ছে এবং প্রায় ৭০ শতাংশ প্রধান ভূগর্ভস্থ জলাধার দীর্ঘমেয়াদে হ্রাস পাচ্ছে। এতে প্রায় ৪৪০ কোটি মানুষ বছরে অন্তত এক মাস তীব্র পানি সংকটে ভোগে। কৃষি খাত, যা বিশ্বব্যাপী স্বাদুপানির প্রায় ৭০ শতাংশ ব্যবহার করে, সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে—যা খাদ্য উৎপাদন ও অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। প্রতিবেদন অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া (ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ), যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং জাকার্তা-ব্যাংককসহ বিভিন্ন শহর ইতোমধ্যেই উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। জাতিসংঘ সতর্ক করেছে—এটি ভবিষ্যতের হুমকি নয়, বরং বর্তমান বাস্তবতা; তাই উত্তোলন সীমা নির্ধারণ, বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছাড়া পানি সংকট স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও বৈশ্বিক স্থিতিশীলতাকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

মুসলিম বিশ্ব

বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মুছল্লীদের সুবিধার জন্য মসজিদুল হারামে নতুন ব্যবস্থা

মসজিদুল হারামে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মুছল্লীদের যাতায়াত সহজ করতে হারামাইন শরিফাইন কর্তৃপক্ষ বিশেষ নির্ধারিত পথ চালু করেছে। এর মাধ্যমে প্রবীণ ও শারীরিকভাবে অক্ষম যিয়ারতকারীদের মসজিদুল হারামে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা হবে।

কর্তৃপক্ষ জানায়, আজিয়াদ সেতু, আল-মারওয়া লিফট, আল-আরকাম সেতু ও আল-আরকাম লিফট হয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশের জন্য আলাদা ট্র্যাক নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব পথ মূলত হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য বরাদ্দ এবং চলাচল সহজ করতে ঢালু র‍্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

এ ছাড়া উমরাহ পালনকারীদের সুবিধার্থে নির্ধারিত পথগুলোর নির্দেশনা সম্বলিত বিশেষ গাইড ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে, যাতে ভিড়ের মধ্যেও মুছল্লীরা নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারেন। এই উদ্যোগকে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মুছল্লীদের জন্য মানবিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

নিজেই সারাবে ক্ষতস্থান, অন্ত্রের চিকিৎসায় যুগান্তকারী আবিষ্কার ‘স্মার্ট লিভিং গ্লু’

অন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগের চিকিৎসায় যুগান্তকারী অগ্রগতি অর্জন করেছেন চীনা গবেষকরা। তারা তৈরি করেছেন ‘স্মার্ট লিভিং গ্লু’, যা জীবিত ব্যাকটেরিয়াকে প্রোগ্রাম করে বানানো এক ধরনের বিশেষ আঠা। এটি অন্ত্রের ভেতরে ক্ষতস্থান নিজে থেকেই শনাক্ত করে সেখানে কাজ করে ক্ষত সারাতে পারে।

গবেষণাটি পরিচালনা করেন দক্ষিণ চীনের কুয়াংতোং প্রদেশের শেনচেন ইনস্টিটিউটস অব অ্যাডভান্সড টেকনোলজি ও শেনচেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল। গবেষণার বিস্তারিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী নেচার বায়োটেকনোলজি-তে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকরা জানান, জিনগতভাবে পরিবর্তিত ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে এ গ্লু তৈরি করা হয়েছে। সক্রিয় হলে এটি বার্নাকল নামের আঠালো প্রোটিন নিঃসরণ করে, যা রক্তক্ষরণের স্থানে সুরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে এবং ক্ষত সারাতে সহায়ক উপাদান ছাড়ে। একবার প্রয়োগের পর ব্যাকটেরিয়াটি কয়েক দিন সক্রিয় থাকে। ইঁদুরের ওপর পরীক্ষায় দেখা গেছে, এতে দ্রুত ওজন ফিরে এসেছে, অন্ত্রের রক্তক্ষরণ কমেছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অংশের উন্নতি হয়েছে।

দাওয়াত সংবাদ

আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব অলিম্পিয়াড-২০২৬

আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ। লাগামহীন মিডিয়া আর সাংস্কৃতিক আধিপত্যের এই যুগে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশু-কিশোরকে ভ্রান্ত আক্বীদা ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা এবং সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে একঝাঁক তরুণ-প্রবীণের কাফেলার নাম আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ। সারা দেশ থেকে ছয় শতাধিক মক্তবের অংশগ্রহণে মাসব্যাপী এনটিভি চ্যানেলে চলছে ‘মক্তব অলিম্পিয়াড–২০২৬’। পবিত্র রামাযান মাসে মক্তব অলিম্পিয়াড–২০২৬-এর বিভিন্ন পর্ব দেশের স্বনামধন্য টেলিভিশন চ্যানেল NTV ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রচারিত হচ্ছে। আয়োজক নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর অধীন পরিচালিত ‘আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ’ অলাভজনক দ্বীনি শিক্ষার অনন্য প্লাটফর্ম। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহভিত্তিক প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষাকে আরও সুসংগঠিত ও উৎসাহব্যঞ্জক করে তুলতেই এই ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজন। মক্তব অলিম্পিয়াড প্রোগ্রাম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সব ঘরনার জনতার মাঝে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া জাগিয়ে চলেছে। প্রাথমিকভাবে সারা দেশে প্রায় ২১টি কেন্দ্রে বাছাই (অডিশন) পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেয় প্রায় ১৫০০ মক্তব শিক্ষার্থী। প্রথম ধাপে অঞ্চলভিত্তিক বাছাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হয়। পরবর্তী ধাপে নির্বাচিতদের জন্য বিশেষ গ্রুমিং ও দিকনির্দেশনামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সবশেষে চূড়ান্ত পর্বে সেরা প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণে মূল অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের কুরআন তেলাওয়াত, মৌলিক দ্বীনি জ্ঞান, মক্তবের পাঠ্যসূচি এবং নৈতিক ও আচরণগত দক্ষতা মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্যে দ্বীনি চেতনা, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ট বিদগ্ধগণ। অদূর ভবিষ্যতে এই শিক্ষা কার্যক্রম ও উদ্যোগ সুষ্ঠুধারার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে সহায়ক ও মাইল ফলক হিসাবে জাতিকে পথ দেখাবে ইনশা-আল্লাহ। প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা, আকর্ষণীয় পুরস্কার ও দ্বীনি শিক্ষা সহায়ক উপহারসামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থাও রাখা হয়। এসব পুরস্কার শিশু-কিশোরদের দ্বীনি শিক্ষায় আরও উদ্বুদ্ধ করবে বলে মনে করছেন আয়োজক কমিটি। আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ সংশ্লিষ্টগণের মতে, মক্তব অলিম্পিয়াড কেবল একটি প্রতিযোগিতা নয়; বরং এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কুরআন ও সুন্নাহর ডোরে বাঁধার একটি অনন্য কার্যকর পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে মক্তব শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সমাজে নতুন করে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য, আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ দীর্ঘদিন ধরে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন মক্তব অলিম্পিয়াড–২০২৬। আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট সকলের মেহনতকে জান্নাতের পাথেয় হিসাবে কবুল করুন– আমীন!

সওয়াল-জওয়াব

ছিয়াম-রামাযান

প্রশ্ন (১): মাস হিসেবে অন্য মাসের উপর রামাযান মাসের কোনো মর্যাদা আছে কি? রামাযান মাসে ইবাদত করলে নেকী বেশি হয় এর কোনো প্রমাণ আছে কি?

-বিলাল
নওগাঁ।

উত্তর: রামাযান মাস অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও ফযীলতপূর্ণ। তার কারণ হলো- ১. রামাযান মাসেই কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘রামাযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে’ *(আল-বাকারা, ২/১৮৫)*। ২. রামাযানে রহমত ও দু‘আ কবুলের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন রামাযান মাস আগমন করে, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়’, অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত (বেঁধে) রাখা হয়’ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯)*। ৩. এ মাসে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বেশি দান করতেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রামাযানে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন, যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর রামাযানের প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে দেখা করতেন এবং তাঁরা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল ছিলেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৬)*। ৪. রামাযান মাসে রয়েছে লায়লাতুল ক্বদর। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘লায়লাতুল ক্বদর এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরীল) তাদের রবের অনুমতিতে সকল আদেশ নিয়ে অবতরণ করেন। সে রাত শান্তিময়, ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/৩-৫)* ইত্যাদি। রামাযান মাসে ইবাদত করলে নেকী বেশি হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘লায়লাতুল ক্বদর এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম *(আল-ক্বদর, ৯৭/৩)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনছারদের এক নারীকে (যার নাম ছিল উম্মু সিনান) বললেন, ‘তুমি আমাদের সঙ্গে হজ্জ আদায় করতে পারনি কেন?’ তিনি বললেন, অমুকের (অর্থাৎ তার স্বামীর) দুটি উট ছিল। একটিতে তিনি ও তার ছেলে হজ্জে গিয়েছিলেন, আর অপরটি আমাদের গোলাম সেচের কাজে ব্যবহার করত। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তবে রামাযান মাসে উমরা আদায় করলে তা একটি হজ্জের সমতুল্য হবে’ অথবা তিনি বলেন, ‘আমার সঙ্গে হজ্জ আদায় করার সমতুল্য হবে’ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৫৬)*। উল্লেখ্য, রামাযানে আমলের ছওয়াব সত্তর গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় মর্মে যে হাদীছ আছে তা যঈফ, গ্রহণযোগ্য নয় *(শুআবুল ঈমান, হা/৩৬০৭)*।

প্রশ্ন (২): রামাযান মাস আসলে অনেকে তওবা করে, মসজিদে আসে, ভালো কাজের চেষ্টা করে। আবার রামাযান শেষ হলে আগের অবস্থায় ফিরে যায়। এভাবে যারা সাময়িক সময়ের জন্য দ্বীনদার হয় তাদের বিধান কী?

-যিনান আহবাব
কুমিল্লা।

উত্তর: রামাযান মাস মুসলিমদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসে দ্বীনদার হওয়া ভালো ও প্রশংসনীয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন রামাযান মাস আগমন করে, তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়’, অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ‘আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত (বেঁধে) রাখা হয়’ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৯)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো, বিশুদ্ধ তওবা; সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী

www.al-itisam.com

প্রবাহিত' *(আত-তাহরীম, ৬৬/৮)*। কিন্তু রামাযান শেষ হলে আবার গুনাহে ফিরে যাওয়া পাপ এবং এটি ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। কেননা তওবার একটি শর্ত হচ্ছে সেই গুনাহের কাজ ভবিষ্যতে না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। সুতরাং রামাযান মাসে যারা তওবা করেছে তাদের উচিত হবে বাকি সময়গুলো তওবার উপরে অবিচল থাকা। এরপরেও কেউ যদি আগের অবস্থায় ফিরে যায়, তাহলে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না এবং তাদের আমলও বাতিল হয়ে যায় না।

প্রশ্ন (৩): রামাযান মাসে শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়। এরপরও মনের মাঝে বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা ও খারাপ চিন্তা কাজ করে, এর কারণ কী?

-জহিরুল ইসলাম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: অন্তরে ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) ও মন্দ চিন্তা আসার ক্ষেত্রে একাধিক বস্তুর ভূমিকা থাকে। যেমন- শয়তান, নফসে আম্মারাহ (মন্দ কাজের আদেশকারী অন্তর), পুরনো বদ অভ্যাস, দুষ্ট লোকের প্ররোচণা ইত্যাদি। আর রামাযান মাসে শয়তানকে বেঁধে রাখা হলেও অবশিষ্ট বস্তুগুলোর কার্যক্রম চলমান থাকে। তবে বছরের বাকি মাসগুলোর তুলনায় রামাযান মাসে গুনাহের পরিমাণ কমে যায় এবং পূর্ণ নিয়ম মেনে ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তির অন্তরে কুমন্ত্রণা বা মন্দ চিন্তা আসার পরিমাণও কমে যায় *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৯; ফাতহুল বারী, ৪/১১৪)*।

প্রশ্ন (৪): চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন বলতে কী বুঝায়? একই উদয়স্থল কীভাবে নির্ধারণ করা হবে?

-কারিমুল মাওলা
কিশোরগঞ্জ।

উত্তর: চাঁদ যখন উদিত হয়, তখন তা পশ্চিম দিগন্ত থেকে পূর্ব দিগন্ত বরাবর ধনুক আকৃতির একটি দীর্ঘ রেখার উপর উদিত হয়। যেসব অঞ্চল এই রেখার আওতাভুক্ত হয়, সেসব অঞ্চলে 'চাঁদের উদয়স্থল' এক ও অভিন্ন ধর্তব্য হয়। আর যেসব অঞ্চল এই রেখার আওতাভুক্ত হয় না, সেসব অঞ্চলে চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন ধরা হয় *(আশ-শারহুল মুমতে, ৬/৩১০; আহকামুল আহিল্লাহ, আহমাদ আল ফুরাইহ, পৃ. ১৮০)*।

প্রশ্ন (৫): ছিয়াম রাখার দ্বীনী ও দুনিয়াবী ফায়েদা জানতে চাই।

-মহসিন মিঞা
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: ছিয়াম রাখার দ্বীনী ফায়েদাসমূহ- ১. তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জিত হয়' *(আল-বাকারা, ২/১৮৩)*। ২. পূর্বের গুনাহ মাফ হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৮)*। ৩. গুনাহ থেকে বাঁচায় *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৫)*। ৪. ছিয়ামের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নিজেই দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৪)*। ৫. ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মিশকের সুগন্ধি অপেক্ষা উত্তম *(ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৪)*।

ছিয়াম রাখার দুনিয়াবী ফায়েদাসমূহ- ১. ইফতারের মূহূর্তে বিশেষ আনন্দ লাভ হয় *(ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫১)*। ২. ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ অর্জিত হয়। ৩. বিভিন্ন শারীরিক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়। ৪. শরীরে থাকা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া নিশ্চিহ্ন হয়। ৫. ধনী-গরীব সবাই একসাথে ছিয়াম পালন করার ফলে পরস্পরের ভেদাভেদ হ্রাস পায় এবং অভাবী লোকেরা সমবেদনা লাভ করে। ৬. একই সময়ে ছিয়াম পালন, সাহারী ও ইফতার করার মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে একতা ও হৃদ্যতা তৈরি হয়।

প্রশ্ন (৬): আমার ছেলে (৮ বছর) ছিয়াম রাখতে চায়। কিন্তু দুপুরের পর প্রচুর দুর্বল হয়ে পড়ে। এরপরও ছিয়াম ছাড়তে চায় না। পরদিন আবার রাখতে চায়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

-ওবাইদুল্লাহ
পাবনা।

উত্তর: এমতাবস্থায় বাচ্চা যদি ছিয়াম রাখতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাদের উৎসাহ দিয়ে ছিয়াম রাখতে দেওয়া উচিত। কেননা রুবাই রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমরা আমাদের শিশুদের ছওম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৬)*। রামাযানে এক নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমাদের বাচ্চারা পর্যন্ত ছওম পালন করছে, তোমার সর্বনাশ হোক! অতঃপর উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাকে প্রহার করেন *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৬০)*।

প্রশ্ন (৭): ছিয়াম যাতে কাযা করতে না হয় এজন্য ঔষধ খেয়ে রামাযান মাসে মাসিক বন্ধ রাখা যাবে কি?

-রুনা পারভিন
ঢাকা।

উত্তর: ঋতু অবস্থায় ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে পরে তা কাযা করবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এটি এমন একটি বিষয়, যা আল্লাহ তাআলা আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন' *(ছহীহ বুখারী, হা/২৯৪)*। তবে ডাক্তারের পরামর্শে শারীরিক কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে ঔষধের মাধ্যমে ঋতু বন্ধ রেখে ছিয়াম রাখতে

পারে *(মাজমূ‘ ফাতাওয়া লি-বিন বায, ১৫/২০০)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও যাবে না’ *(ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪১)*।

প্রশ্ন (৮): কী কী কারণে ছিয়াম ভেঙে যায়?

-মোস্তফা মনোয়ার
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর: ছিয়াম ভঙ্গের কারণগুলো নিম্নরূপ- ১. ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া বা পান করা অথবা এর স্থলাভিষিক্ত এমন কিছু গ্রহণ করা *(আল-বাকারা, ২/১৮৭; ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৩)*। ২. স্ত্রী সহবাস করা বা ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত ঘটানো *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৬)*। ৩. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা *(তিরমিযী, হা/৭২০)*। ৪. হায়েয বা নিফাস শুরু হওয়া *(ছহীহ বুখারী, হা/৩০৪)*।

প্রশ্ন (৯): ছিয়াম রেখে রক্ত পরীক্ষা করা বা ডায়ালাইসিস করা যাবে কি? করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-হাসান আলী
চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর: প্রয়োজনে ছিয়াম অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করা যাবে এবং তা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় হিজামা করেছেন এবং ছিয়াম অবস্থায়ও হিজামা করেছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৮)*। কিন্তু ছিয়াম অবস্থায় ডায়ালাইসিস করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়, কেননা রক্তের সাথে পুষ্টি দেহে প্রবেশ করে থাকে *(মাজমূ‘ ফাতাওয়া ইবনু বায, ১৫/২৭৫; মাজমূ‘ ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ১৯/২৭২)*।

প্রশ্ন (১০): ছিয়াম অবস্থায় ইন্টারনেটে অশালীন কিছু দেখলে ছিয়ামের উপর কোনো প্রভাব পড়ে কি?

-সাদেক
বরিশাল।

উত্তর: ছিয়াম অবস্থায় ইন্টারনেটে অশালীন কিছু দেখলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না, তবে তা ছিয়ামের ছওয়াব কমিয়ে দেয় এবং কখনো কখনো ছিয়ামের ছওয়াব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘অনেক ছিয়াম পালনকারী আছে, ছিয়াম থেকে তাদের প্রাপ্য কেবল ক্ষুধা। আর অনেক রাতজাগা ইবাদতকারী আছে, ক্বিয়াম (ছালাত) থেকে তাদের প্রাপ্য কেবল জাগরণ’ *(ইবনু মাজাহ, হা/১৬৯০)*। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা, মন্দ কাজ ও অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ পরিত্যাগ করে না, আল্লাহর কাছে তার খাবার ও পানাহার ত্যাগের কোনো প্রয়োজন নেই’ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৩)*।

প্রশ্ন (১১): কোনো ব্যক্তি যদি রাতে কাজ করে, দিনের বেশিরভাগ সময় ঘুমায় এবং মাঝে মাঝে ইফতারও দেরিতে করে, এতে তার ছিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে কি?

-পলাশ মণ্ডল
ঢাকা।

উত্তর: রাতে কাজের কারণে ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেশিরভাগ সময় ঘুমালে ছিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না, বরং ছিয়াম বিশুদ্ধ হবে *(আল-মাজমূ‘, ৬/৩৪৬)*। তবে দিনের ছালাতগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যিক। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা ছালাতসমূহের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী ছালাতের এবং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও’ *(আল-বাকারা, ২/১৮৪)*। আর ইফতার তাড়াতাড়িই করতে হবে, এ সময় স্বেচ্ছায় ঘুমানো গ্রহণ হবে না। সাহল বিন সা‘দ থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘মানুষ ততক্ষণ কল্যাণের সাথে থাকবে, যতক্ষণ তারা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে’ *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮)*।

প্রশ্ন (১২): রামাযানে দিনের বেলায় স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি স্বামী জোর করে শারীরিক সম্পর্ক করে, তাহলে স্ত্রীর করণীয় কী? তার ছিয়াম ভেঙে যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: এমতাবস্থায় ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা জোরপূর্বক হলেও স্ত্রী দায়ী নয়। এক্ষেত্রে স্বামীকেই ধারাবাহিকভাবে দুইমাস ছিয়াম রাখতে হবে *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১১১১)*। জরিমানা স্ত্রীর উপর প্রযোজ্য হয় না, শুধু স্বামীর উপরই হয়। তবে এসময় স্ত্রী প্রাণপণে স্বামীকে বুঝানোর চেষ্টা করবে *(তিরমিযী, হা/৩০৯৪)*।

প্রশ্ন (১৩): রামাযান মাসে ছিয়াম রেখে খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করার জন্য খাবার মুখে দেওয়া যাবে কি? এমতাবস্থায় যদি ভুলবশত সামান্য কিছু পেটে চলে যায়, তাহলে ছিয়াম ভাঙবে কি?

সুনিয়া জাহান, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: ছিয়াম অবস্থায় খাবারের স্বাদ পরীক্ষা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে ভুলবশত কিছু পেটে চলে গেলেও ছিয়াম ভাঙবে না *(ছহীহ বুখারী, বাব ২৫, হা/১৯৩০-এর পূর্বে; ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৬৯)*। তবে স্বাদ পরীক্ষা করার সময় খাবার গিলে ফেলা যাবে না। জিহ্বায় স্বাদ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা থুথুর সঙ্গে ফেলে দিতে হবে অথবা পানি দিয়ে ভালোভাবে কুলি করে মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (১৪): ‘ফজর হয়েছে কি-না’ এ সন্দেহে সাহারীর শেষ সময়ে খাওয়াদাওয়া করলে ছিয়ামের হুকুম কী? ছিয়াম কি কাযা করতে হবে?

-মনিরুল ইসলাম
কুড়িগ্রাম।

উত্তর: ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তি যদি ফজর উদিত হয়েছে কি-না এ বিষয়ে সন্দেহে থাকে এবং তার কাছে নিশ্চিতভাবে ফজর উদিত হওয়া স্পষ্ট না হয়, তাহলে সে সময় সাহারী খেলে তার উপর কোনো দোষ নেই এবং তার ছিয়াম ছহীহ হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমরা খাও এবং পান করো, যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। তারপর রাত পর্যন্ত ছিয়াম পূর্ণ করো’ *(আল-বাকারা, ২/১৮৭)*। এখানে আল্লাহ তাআলা ফজর স্পষ্টভাবে উদিত হওয়ার সাথে খাওয়া বন্ধ করাকে শর্তযুক্ত করেছেন, শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে নয়। সুতরাং তার ছিয়ামটি কাযা আদায় করতে হবে না।

প্রশ্ন (১৫): খাওয়ার পর দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার গিলে ফেললে ছিয়াম ভেঙে যায় কি?

-বদিউজ্জামান
মংলা, বাগেরহাট।

উত্তর: ছুবহে ছাদিক উদিত হওয়ার পর দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া হয়, তাহলে ছিয়াম ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ভুল করে অথবা এমনিতেও খেয়ে নেয়, তাহলে ছিয়াম ভাঙবে না *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৬৯; ইবনু মাজাহ, হা/২০৪৩)*।

প্রশ্ন (১৬): ছিয়াম রেখে কোনো ব্যক্তি যদি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে এবং জীবন নাশের আশঙ্কা করে, তাহলে তার করণীয় কী?

-জহিরুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর: এমতাবস্থায় জীবন নাশের আশঙ্কা করলে ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং তার পরিবর্তে অন্য একদিন কাযা আদায় করবে *(আল-বাকারা, ২/১৯৫; তা‘লীকাতু ইবনে উছায়মীন আলাল কাফী, ৩/১২৪)*। তবে শুধু পিপাসা বা ক্ষুধার কষ্টের কারণে ছিয়াম ভঙ্গ করা যাবে না, বরং ধৈর্যধারণ করবে এবং প্রয়োজনে মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালবে।

প্রশ্ন (১৭): ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তি ছিয়াম ভাঙলে তার বিধান কী? তার কোনো কাফফারা আছে কি?

-হাফেজ বশির
নাটোর।

উত্তর: নিশ্চয়ই শারঈ কোনো কারণ ছাড়া রামাযানের দিনে ছিয়াম ভেঙে ফেলা কাবীরা গুনাহ এবং ভয়াবহ অপরাধ, যা হারাম। কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে ছিয়াম ভেঙে ফেলা এই ফযীলতপূর্ণ সময়ের পবিত্রতা লঙ্ঘন করা এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বিরোধিতা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘অতঃপর রাত পর্যন্ত তোমরা ছিয়াম পূর্ণ করো...’ *(আল-বাকারা, ২/১৮৭)*। যে ব্যক্তি এতে লিপ্ত হয়েছে, তার আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করা উচিত অর্থাৎ অন্তর থেকে অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে শারঈ কোনো ওযর ছাড়া আর কখনো ছিয়াম ভাঙবে না এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প করা। এছাড়া তাকে ওই দিনের ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে। তবে তার উপর কোনো কাফফারা নেই *(আবূ দাঊদ, হা/১৬৭৬)*। আর যদি তার ছিয়াম ভাঙা সহবাসের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তবে কাযার পাশাপাশি তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কাফফারার ক্রম হলো একজন দাস মুক্ত করা; যদি তা সম্ভব না হয়, তবে একটানা দুই মাস ছিয়াম রাখা; যদি তাও সক্ষম না হয়, তবে প্রতিটি ছিয়ামের (ভঙ্গ হয়েছে) বিনিময়ে তার জন্য ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৩৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১১১১)*।

প্রশ্ন (১৮): আমরা মসজিদে একসাথে ইফতার করি। আযানের আগেই আমি সময়মতো ইফতার করলে অনেকে বলে, সারাদিন অপেক্ষা করতে পারলে আর দুই মিনিট সহ্য হয় না! সর্তক থাকা ভালো। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

-শাহিন আলম
ময়মনসিংহ।

উত্তর: ছিয়ামসহ যেকোনো ইবাদত করলে নেকী হবে একথা নয়, বরং রাসূল ﷺ-এর পদ্ধতিতে করলে নেকী হবে। রাসূল ﷺ তাড়াতাড়ি ইফতার করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব, দুই মিনিট দেরি না করে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করলে নেকী হবে। পক্ষান্তরে ২ মিনিট বা আরো কমবেশি দেরি করলে আমলটি ইয়াহূদী-নাছারার সাথে মিলে যায় *(আল-বাকারা, ২/১৮৭; ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭, ৪/১৯৯)*।

প্রশ্ন (১৯): কারো রূহের মাগফিরাত কামনার জন্য রামাযান মাসে ইফতারের আয়োজন করা যাবে কি?

-বুলবুল
ঢাকা।

উত্তর: মৃত ব্যক্তির ক্ষমা প্রার্থনার জন্য রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত নির্ধারিত কোনো সময় নেই, বরং একাধিক হাদীছ প্রমাণ করে রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময় ক্ষমা চাইতেন, এমনকি

www.al-itisam.com

করবস্থানে গিয়েও। আর রামাযানে মৃত ব্যক্তির নামে খাছ করে কিছু করার আমল প্রমাণিত নয়; বরং তা বিদআত। তবে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও দান করা যায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার ধারণা হয় যে, যদি তিনি কথা বলতে পারতেন তবে ছাদাকা করতেন। আমি কি তার পক্ষ হতে ছাদাকা করব? আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'হ্যাঁ, তার পক্ষ হতে ছাদাকা করতে পার' *(ছহীহ বুখারী, হা/২৭৬০)*।

প্রশ্ন (২০): পুরো রামাযান মাসে সাহারীতে জাগানোর জন্য মসজিদের মাইকে ডাকা হয়, গজল বাজানো হয় এবং পূর্বসতর্কতামূলক সাহারীর সময় শেষ হওয়ার ১০/১২ মিনিট আগে থেকে মসজিদে সাহারী খেতে বলা হয়। এই কাজগুলো কি শরীআতসম্মত?

-মাছিদুল ইসলাম
গাইবান্ধা।

উত্তর: কুরআনুল কারীমের ভাষ্যমতে ছুবহে ছাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত সাহারী গ্রহণ করা যাবে *(আল-বাকারা, ২/১৮৭)*। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক্ষেত্রে ফজরের আযানকে মানদণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাতে (ছুবহে ছাদিক উদিত হওয়ার পূর্বে) আযান দেয়। সুতরাং তোমরা খাও এবং পান করো ইবনু উম্মে মাকতূম (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আযান দেওয়া পর্যন্ত' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬২৩)*। অতএব, সাহারীর ক্ষেত্রে আযান ব্যতীত অন্য কোনো মাইকিংসহ যেকোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা নাজায়েয।

প্রশ্ন (২১): আমাদের গ্রামে অনেকে বলে, পেটের ছিয়ামের সাথে সাথে হাতের ছিয়াম, চোখের ছিয়াম, কানের ছিয়াম ও হৃদয়ের ছিয়ামও রাখতে হয়; না হলে ছিয়াম হবে না। যেমন- কানের ছিয়াম নোংরা ও অশ্লীল কথা না শোনা। এসব কথারর কোনো ভিত্তি আছে কি?

-সারওয়ার হোসাইন
লালমনিরহাট।

উত্তর: উক্ত কথাগুলো হুবহু কুরআন-সুন্নাহতে আমরা পাইনি। তবে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং মিথ্যার উপর ভিত্তি করে কাজ করা থেকে বিরত থাকল না, তার ছিয়ামের আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই (অর্থাৎ তার ছিয়াম আল্লাহ কবুল করবেন না)' *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৩)*। সুতরাং ছিয়াম অবস্থায় গুনাহ করলে ছিয়াম সম্পূর্ণ হবে না এবং কবুল হবে না *(ফাতহুল বারী, ৪/১১৭)*।

প্রশ্ন (২২): বিমানে দীর্ঘ ফ্লাইটে অঞ্চলের পরিবর্তনে ২০ ঘণ্টার বেশি ছিয়াম হলে কীভাবে আমল করবে?

-নাজমুল ইসলাম
মেহেরপুর।

উত্তর: ছিয়াম রাখার পর যেখানে সূর্যাস্ত পাবে সেখানে ইফতার করবে। অঞ্চল পরিবর্তনের কারণে যদি সূর্যাস্ত পেতে বিলম্ব হয়, তাহলে সর্বশেষ অঞ্চলের সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যদিও ছিয়ামের দৈর্ঘ্য ২০+ ঘণ্টা বা এর বেশি হয় *(আল-বাকারা, ২/১৮৭; তিরমিযী, হা/৬৯৭)*। তবে বিমানে চলমান স্থানীয় সময় অনুযায়ী সূর্যাস্ত হলে ইফতার করা যায় *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৫)*।

প্রশ্ন (২৩): বর্তমানে অনেক আরামে সফরের সুযোগ আছে, সফরের ক্লান্তি খুব একটা অনুভূত হয় না। এমতাবস্থায় সফরে ছিয়াম রাখা উত্তম, নাকি পরে কাযা করাই উত্তম হবে?

-নাসিফ মামুন
সিলেট।

উত্তর: সফর অবস্থায় ছিয়াম না রাখাই উত্তম। হামযা ইবনু আমর আল-আসলামী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! সফর অবস্থায় ছিয়াম পালনের ক্ষমতা আমার রয়েছে। এ সময় ছিয়াম পালন করলে আমার কোনো গুনাহ হবে কি? তিনি বললেন, 'এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিশেষ অবকাশ, যে তা গ্রহণ করবে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি কেউ ছিয়াম পালন করতে চায়, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১১২১)*।

প্রশ্ন (২৪): খতমে তারাবীহ পড়ার বিধান কী? তারাবীহতে কুরআন খতম করতে গিয়ে তাড়াহুড়া করে পড়লে ছালাত হবে কি?

-মাজেদুর রহমান
দিনাজপুর।

উত্তর: খতমে তারাবীহ নামে কুরআনের অশুদ্ধ তেলাওয়াত এবং ভুলত্রুটি পরোয়া না করে যেভাবে কুরআন খতম করা হচ্ছে এটা তারাবীহর ছালাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। খতমে তারাবীহর নামে যেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে চাঁদা তুলে টাকাপয়সা খরচ করে একাধিক ইমাম দিয়ে কুরআন খতম করানো হচ্ছে এটা তারাবীহর ছালাতের উদ্দেশ্য নয়। খতমে তারাবীহর নামে ছালাতের ধীরস্থিরতা ও বিনয়ী ভাব ক্ষুণ্ন করে তারাবীহ পড়া তারাবীহর ছালাতের উদ্দেশ্য নয়। বরং জামাআতে হোক বা একাকী হোক দীর্ঘ কিয়াম, রুকূ, সিজদার মাধ্যমে বিনয়ী হয়ে আল্লাহকে

সন্তুষ্ট করার আশায় তারাবীহর ছালাত আদায় করাই হচ্ছে এই ছালাতের উদ্দেশ্য, যা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর হাদীছের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। তাই তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থিরভাবে তেলাওয়াত করতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান ও রামাযানের বাইরে এগারো রাকাআতের বেশি (কিয়ামুল লায়ল) ছালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন (এমনভাবে যে) তুমি এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য নিয়ে আর জিজ্ঞাসা করো না! এরপর তিনি (আরও) চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন (এমনভাবে যে) এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য নিয়ে আর জিজ্ঞাসা করো না! এরপর তিনি তিন রাকআত ছালাত আদায় করতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৭)*। তবে কেউ যদি শুদ্ধভাবে ও ধীরস্থিরতার সঙ্গে তিলাওয়াত করে কুরআন খতম করতে পারেন, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (২৫): তারাবীহর ছালাতে কুরআন দেখে দেখে তেলাওয়াত করা যাবে কি? দলীলসহ জানাবেন।

-আব্দুল কাদের
রাজশাহী।

উত্তর: তারাবীহর ছালাতে কুরআন দেখে দেখে তেলাওয়াত করা যায়। কেননা আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর একজন গোলাম ছিল, যে রামাযান মাসে মুছহাফ দেখে তার ইমামতি করতেন *(ছহীহ বুখারী, বাব ৫৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫)*।

প্রশ্ন (২৬): মসজিদে ইমামের সাথে আট রাকআত তারাবীহ পড়ার পর রাতে আবার বাড়িতে তারাবীহ পড়া যাবে কি?

-জিহাদ হোসাইন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: মসজিদে ইমামের সাথে আট রাকআত তারাবীহ পড়ার পর রাতে আবার বাড়িতে তারাবীহ পড়া যাবে না। কেননা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই ছালাত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান ও রামাযানের বাইরে এগারো রাকআতের বেশি (কিয়ামুল লায়ল) ছালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন (এমনভাবে যে) তুমি এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য নিয়ে আর জিজ্ঞাসা করো না! এরপর তিনি (আরও) চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন (এমনভাবে যে) এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য নিয়ে আর জিজ্ঞাসা করো না! এরপর তিনি তিন রাকআত ছালাত আদায় করতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৭)*। তবে ছালাতুল হাজত অথবা তাহিয়্যাতুল ওযূ এসব ছালাতকে সামনে রেখে দুই রাকআত ছালাত পড়ে দীর্ঘ সময় যিকির-আযকার করতে পারে।

প্রশ্ন (২৭): মহিলার ইমামতিতে মহিলারা তারাবীহর ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-বাবুল সরকার
রাজশাহী।

উত্তর: মহিলার ইমামতিতে মহিলারা তারাবীহর ছালাত আদায় করতে পারে। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, নিশ্চয় আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা নফল ছালাতে মহিলাদের ইমামতি করতেন। তাদের সাথে কাতারে দাঁড়াতেন *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৫২৩২)*।

প্রশ্ন (২৮): তারাবীহর বিতরে ইমাম দু'আর সময় 'আল্লাহুম্মাহ্দি না' বলবে নাকি 'আল্লাহুম্মাহ্দি নী' বলবে? কারণ সেখানে তো সবার জন্য দু'আ করা হয়। ইমামের এ দু'আ পড়ার সময় মুক্তাদীরাও কি পড়বে?

-নুর নবী
নওগাঁ।

উত্তর: হাদীছে যে শব্দে এসেছে সে শব্দই বলবে, পরিবর্তন করা যাবে না। সুতরাং ইমাম বলবে, আল্লাহুম্মাহ্দি নী... আর মুক্তাদীরা বলবে, আমীন! *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৩১১; আবূ দাঊদ, হা/১৪২৫)*।

প্রশ্ন (২৯): আমাদের মসজিদে ২০ রাকআত তারাবীহ হয় এবং খুব তাড়াহুড়া করে তেলাওয়াত ও রুকূ-সিজদা করা হয়। একটু দূরে আহলেহাদীছ মসজিদে আট রাকআত তারাবীহ হয় এবং তারা ধীরে ধীরে ছালাত আদায় করে। এমতাবস্থায় একটু দূরের মসজিদে যাওয়া যাবে কি?

-মকবুল ইসলাম
জামালপুর।

উত্তর: ১. ছালাতে রুকূ-সিজদা ধীরস্থিরভাবে না হলে ছালাত বাতিল হবে। এক ব্যক্তির ছালাতে রুকূ-সিজদা ঠিকমতো না হওয়ায় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় ছালাত আদায় করার জন্য বলেছিলেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৭)*। ২. ধীরস্থিরভাবে তেলাওয়াত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে' *(আল-মুযযাম্মিল, ৭৩/৪)*। ৩. লম্বা সময় রুকূ-সিজদা করতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান ও রামাযানের বাইরে এগারো রাকআতের বেশি (কিয়ামুল লায়ল) ছালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন (এমনভাবে যে) তুমি এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য নিয়ে আর জিজ্ঞাসা করো না! এরপর তিনি (আরও) চার রাকআত ছালাত আদায় করতেন (এমনভাবে যে) এর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য নিয়ে আর জিজ্ঞাসা করো না! এরপর তিনি

তিন রাকআত ছালাত আদায় করতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৭)*। এ সমস্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, যেখানে ধীরস্থিরভাবে ছালাত হবে সেখানেই ছালাত আদায় করা উচিত।

প্রশ্ন (৩০): সারাদিন না খেয়ে থেকে ইফতারীতে বেশি খাওয়ার কারণে ইবাদতে অনীহা চলে আসে। এমতাবস্থায় মাঝে মাঝে তারাবীহ পড়া হয় না। এতে কি আমার পাপ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: রামাযান মাসে জামাআতের সাথে তারাবীহর ছালাত আদায় করা সুন্নাত *(ছহীহ বুখারী, হা/৯২৪)*। সুতরাং তারাবীহর ছালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত *(আশ-শারহুল মুমতে', ৪/৫৯)*। উল্লেখ্য, বেশি খাওয়ার কারণে যেহেতু ইবাদত পালনে অনীহা আসে, তাই পরিমিত আহার গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন (৩১): অনেক সময় বেশি দীর্ঘ ছালাত আদায়ের জন্য তারাবীহর ছালাত বাড়িতেই আদায় করা হয়। এতে বাড়ির লোক আমাকে বকাবকি করে। এভাবে তারাবীহর ছালাত জামাআতে আদায় না করলে কি পাপ হবে?

-রাফিউল ইসলাম
টাঙ্গাইল।

উত্তর: ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য যেকোনো ছালাতগুলো বাড়িতে আদায় করাই উত্তম। রাসূল ﷺ বলেন, 'হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঘরেই ছালাত আদায় করো। কেননা ফরয ছালাত ছাড়া লোকেরা ঘরে যে ছালাত আদায় করে তা-ই উত্তম' *(ছহীহ বুখারী, হা/৭৩১)*। তারাবীহর ছালাতের জন্য লোকজন একত্রিত হলেও ফরয হওয়ার আশঙ্কায় তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে রাসূল ﷺ ঘর থেকে বের হননি *(ছহীহ বুখারী, হা/১১২৯)*। রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন ছালাত উত্তম? আমার ঘরে আদায় করা ছালাত নাকি মসজিদের ছালাত? তিনি বলেন, 'তুমি কি আমার ঘর দেখ না, তা মসজিদের কত নিকটে? তা সত্ত্বেও আমার মসজিদে ছালাত পড়া অপেক্ষা আমার ঘরে ছালাত পড়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। কিন্তু ফরয ছালাত হলে (তা মসজিদে পড়বে)' *(ইবনু মাজাহ, হা/১৩৭৮)*।

প্রশ্ন (৩২): অনেক মসজিদে দেখা যায়, তারাবীহর ছালাতে প্রতি চার রাকআত পর 'সুবহানা যিল মুলকি...' দু'আটি পড়ে। উক্ত দু'আটি পড়া যাবে কি?

-সুমন রানা
রংপুর।

উত্তর: এটি একটি বানোয়াট দু'আ। তারাবীহর ছালাতে প্রতি চার রাকআত শেষে নিয়ম করে এই দু'আ পাঠ করা বিদআত। কেননা এ ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে কোনো ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। বরং ছালাত শেষে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দু'আগুলো পাঠ করা সুন্নাত।

প্রশ্ন (৩৩): ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময় কত? রামাযান মাস ব্যতীত অন্য সময় ই'তিকাফ করা যাবে কি? যেমন- রাসূল ﷺ একবার রামাযানে না করে শাওয়াল মাসে করেছিলেন।

-সাকিবুল হাসান
নীলফামারী।

উত্তর: ই'তিকাফ ছিয়াম অবস্থায় জুমআ মসজিদে ও রামাযানের শেষ দশকে হতে হবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, ছিয়াম না রেখে ই'তিকাফ করবে না এবং জামে মসজিদে ই'তিকাফ করবে *(আবূ দাঊদ, হা/২৪৭৩)*। ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সুন্নাত সময় ১০ দিন *(ছহীহ বুখারী, হা/৮১৩)*। আর উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু যে একদিন ই'তিকাফ করেছিলেন তা ছিল মানতের ছিয়াম। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু জাহিলিয়্যাতের যুগে মসজিদে হারামে ই'তিকাফ করার মানত করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'তোমার মানত পূরণ করো' *(ছহীহ বুখারী, হা/২০৪৩)*।

প্রশ্ন (৩৪): ই'তিকাফে কখন প্রবেশ করতে হবে? ই'তিকাফরত অবস্থায় কোন কাজগুলো করা যাবে না?

-আবূ ইয়াসির
কুমিল্লা।

উত্তর: (ক). রামাযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নাত *(ছহীহ বুখারী, হা/২০২৬)*। উক্ত দশক শুরু হয় ২০ রামাযানের সূর্যাস্তের পর। এজন্য যিনি ই'তিকাফ করতে ইচ্ছুক তিনি ২০ রামাযানের সূর্যাস্তের পূর্বেই সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে মসজিদে প্রবেশ করবেন।

(খ). ই'তিকাফকারীর জন্য যেসব কাজ নিষিদ্ধ- ১. জরুরী প্রয়োজন (যেমন- প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি) ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া। ২. স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। ৩. স্ত্রীর সঙ্গে আলিঙ্গন করা। ৪. রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হওয়া। ৫. জানাযায় অংশগ্রহণ করার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া *(আবূ দাঊদ, হা/২৪৭৩)*।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৩৫): ই'তিকাফ অবস্থায় কী কী করা যাবে না? ইফতার করার পর রাতে ও ফজরের আগে খাবার খাওয়ার জন্য বাড়িতে যাওয়া যাবে কি?

-হাবিবুর রহমান
নীলফামারী।

উত্তর: ই'তিকাফ অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ *(আল-বাকারা, ২/১৮৭)*। পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ হতে বের হওয়া নিষেধ। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, ছিয়াম না রেখে ই'তিকাফ করবে না এবং জামে মসজিদে ই'তিকাফ করবে *(আবূ দাঊদ, হা/২৪৭৩)*। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়, চাষাবাদ, পশুপালন, এমনকি জানাযায় অংশগ্রহণের জন্যও মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না। আর ই'তিকাফকারীকে মসজিদে খাবার দিয়ে যেতে হবে, সে নিজে বের হবে না। কোনো প্রয়োজনে পরিবারের সদস্যরা তার কাছে আসতে পারে, যেমন- রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ তাঁর কাছে আসতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/২০৩৮)*।

প্রশ্ন (৩৬): ক্বদরের রাতে কি তাকদীর নির্ধারণ করা হয়? এই রাতে কোন আমলটি বেশি বেশি করব? আর এ রাত মসজিদে অনুষ্ঠান উদযাপন করার মাধ্যমে পালন করা যাবে কি?

-তাহের বাবু
ফেনী।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা লেখক ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেন সে বছরে যা কিছু সংঘটিত হবে তা লাওহে মাহফূয থেকে নকল (লিপিবদ্ধ) করতে। লায়লাতুল ক্বদরে 'উম্মুল কিতাব' থেকে সে বছরের রিযিক, মৃত্যু, জীবন ও বৃষ্টি সবকিছুই লিখে নেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করা হয় *(আদ-দুখান, ৪৪/৪)*। ক্বদরের রাত্রিতে যে আমলগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করা উচিত, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো- ১. দু'আ করা। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যদি আমি ক্বদরের রাত পেয়ে যাই, তখন কী দু'আ করব? তিনি বললেন, 'তুমি বলো اللهم إنك عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন' (তিরমিযী, হা/৩৫১৩)। ২. কিয়ামুল লায়ল ও তাহাজ্জুদ আদায় করা। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় ক্বদরের রাতে (ছালাতে) দাঁড়ায়, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়' *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯০১; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬০)*। ৩. কুরআন তিলাওয়াত (তাদাব্বুরসহ) করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তারা এর আয়াতগুলো গভীরভাবে চিন্তা করে' *(ছোয়াদ, ৩৮/২৯)*। ৪. ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা শেষ রাতে (রাতে জাগ্রত হয়ে) ইস্তিগফার করত' *(আয-যারিয়াত, ৫১/১৮)*। রামাযানের শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক বিষয়। কেননা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় লায়লাতুল ক্বদরে (ছালাতে) দাঁড়ায়, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯০১; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬০)*। কিন্তু নির্দিষ্ট করে সাতাশতম রাত বা অন্য কোনো রাতকে কেন্দ্র করে মসজিদে বা অন্য কোনো জায়গায় নারী–পুরুষের একত্র সমাবেশ, সেই রাতকে ছালাত, যিকির ও দারসের মাধ্যমে পালন করা এবং ভোজের (খাবারের আয়োজন) করা, এভাবে পালন করার কোনো প্রমাণ নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, ছাহাবা ও তাবেঈন থেকে নেই। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে যে ব্যক্তি এমন কিছু নতুন সংযোজন করল, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত *(ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)*। ইরবায ইবনু সারিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা নবউদ্ভাবিত বিষয়সমূহ থেকে সতর্ক থাকো। কেননা প্রত্যেক নবউদ্ভাবনই বিদআত আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা' *(আবূ দাঊদ, হা/ ৪৬০৭)*।

প্রশ্ন (৩৭): নির্দিষ্টভাবে লায়লাতুল ক্বদর কোন রাতে হবে তা বলা যাবে কি? এর কোনো আলামত আছে কি?

-মাহফুজুর রহমান
নাটোর।

উত্তর: লায়লাতুল ক্বদর শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোর কোনো এক রাত, তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। তবে তার কিছু আলামত রয়েছে- ১. সূর্যের তীব্র আলোকরশ্মি থাকবে না *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৭০)*। ২. রাতটি হবে প্রফুল্লময় তথা না গরম, না ঠান্ডা। সেদিন সূর্য উঠবে লাল বর্ণে, তবে দুর্বল থাকবে *(ছহীহ ইবনু*

খুযায়মা, হা/২১৯২)। ৩. রাতের বাতাস হবে প্রশান্তিদায়ক (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২৭৬৫)। ৪. সে রাতে বৃষ্টি বর্ষণ হতে পারে (ছহীহ বুখারী, হা/৮১৩)।

প্রশ্ন (৩৮): জনৈক ব্যক্তি ছিয়াম রাখতে অক্ষম। এজন্য তিনি আমাকে ১০,০০০ টাকা দিয়েছেন। এখন তার ছিয়ামগুলো আমাকে রাখতে হবে কি? রাখতে হলে আমার ছিয়ামের সাথে তার ছিয়ামের নিয়্যত করলে তা পূর্ণ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: বার্ধক্যের কারণে বা এমন অসুস্থতার কারণে যা থেকে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন ব্যক্তি ছিয়াম পালন করতে অক্ষম হলে ফিদইয়া (একজন মিসকীনের খাবার) দিতে হবে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৫০৫)। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যাদের জন্য ছিয়াম কষ্টসাধ্য তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদইয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা' (আল-বাকারা, ২/১৮৪)।

প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি মিসকীন হলে সে তা ভক্ষণ করবে, এটা হলো ছিয়াম পালন না করার জরিমানা। তার পক্ষ থেকে কাউকে ছিয়াম রাখতে হবে এমন বিধান নেই। আর সে যদি মিসকীন না হয়, তাহলে সমাজের কোনো মিসকীনকে দিয়ে দিবে। ফিদইয়া হলো একজন মিসকীনকে সোয়া এক কেজি খাদ্য প্রদান করবে (দারাকুত্বনী, হা/২৪০৬, সনদ ছহীহ; ইরওয়া, হা/৯১২)। তবে বেশিও দিতে পারে।

প্রশ্ন (৩৯): রামাযানের কাযা ছিয়ামগুলো পালন করার জন্য কি সময় নির্ধারণ করা আছে? যেমন- পরের রামাযান আসা পর্যন্ত, নাকি মৃত্যুর আগে পালন করলেই হবে?

-মো. মুশাররফ
বগুড়া।

উত্তর: ছুটে যাওয়া ছিয়াম কাযা করতেই হবে, যত তাড়াতাড়ি কাযা করা সম্ভব। কেননা তা ফরয বিধান। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার উপর রামাযানের যে কাযা হয়ে যেত তা পরবর্তী শা'বান ব্যতীত আমি আদায় করতে পারতাম না। ইয়াহইয়া বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যস্ততার কারণে কিংবা নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে ব্যস্ততার কারণে (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫০)। তবে দেরি করাতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (৪০): আমি মাঝে মাঝে নফল ছিয়াম রাখি। একদিন এক বন্ধুর সাথে দেখা হলে সে আমাকে ছিয়াম ভাঙতে বাধ্য করে। আমার প্রশ্ন হলো, পরবর্তীতে আমাকে কি এই নফল ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে?

-আ. সামাদ
নরসিংদী।

উত্তর: নফল ছিয়ামের কাযা আদায় করা আবশ্যক নয়। বাড়িতে খাবার কিছু না থাকলে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিয়াম রাখতেন এবং খাবার হাদিয়া দেওয়া হলে ছিয়াম ভেঙ্গেও ফেলতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫৪)। তবে কাযা আদায় করতে পারে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ছাহাবীদের জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। তিনি দাওয়াত দিলেন এবং তারা আসল। যখন তাদের সামনে খাবার রাখা হলো, তখন তাদের মধ্য হতে একজন ছাহাবী বললেন, আমি ছায়েম। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তোমাদের ভাই পরিশ্রম করে খাবার প্রস্তুত করেছে এবং দাওয়াত দিয়েছে, এখন তুমি বলছ, আমি ছায়েম! তুমি ছিয়াম ছেড়ে দাও এবং চাইলে তার স্থানে অন্যদিনে ছিয়াম রেখো' (বায়হাক্বী, হা/৮৩৬২)।

প্রশ্ন (৪১): কোনো ব্যক্তি যদি শাওয়াল এর ৬টি ছিয়ামের মধ্যে ৪টি রাখে আর কারণবশত বাকি ২টি রাখতে না পারে, তাহলে পরবর্তী মাসে এ ছিয়াম আদায় করা যাবে কি বা এর কোনো কাযা আছে কি?

-জাকির
রাজশাহী।

উত্তর: শাওয়াল মাসের ছিয়াম শাওয়াল মাসেই রাখতে হবে, তা পরের মাসে রাখার বা কাযা করার কোনো বিধান নেই (মাজমূ ফাতাওয়া লি-বিন বায, ১৫/৩৮৯)। তবে রামাযানের কাযা ছিয়াম পালন করার আগে শাওয়ালের ছিয়াম পালন করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই।

যাকাত-ফিতরা

প্রশ্ন (৪২): বেশিরভাগ মানুষ রামাযান মাসে যাকাত বের করে। এই মাসেই কি যাকাত আদায় করতে হয়?

-দিদারুল ইসলাম
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর: নিসাব পরিমাণ সম্পদের উপর হিজরী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এক বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথেই যাকাত আদায় করা ফরয হয়ে যায় (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)। সুতরাং এক বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথেই যাকাত আদায় করতে হবে, সেটা রামাযান মাস হোক অথবা অন্য মাস হোক। এক্ষেত্রে বিলম্ব করা ঠিক নয় (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৪৩): যারা ফিতরা গ্রহণ করে, তাদেরকেও কি ফিতরা আদায় হবে? দেওয়ার মতো সামর্থ্য না থাকলে কী করবে?

-হাবিবুর রহমান
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর: যাকাতুল ফিতর এর হক্বদার ব্যক্তিকেও ফিতরা আদায় করা ফরয। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের মধ্যে দাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সবার উপর যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন, খেজুর এক ছা‘ অথবা যব এক ছা‘। আর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, মানুষ ঈদের ছালাতে বের হওয়ার আগেই তা আদায় করতে *(ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৪)*। ফকীরকেও ফিতরা আদায় করতে হবে, যদি তাঁর কাছে তাঁর পরিবারসহ একদিনের অতিরিক্ত খাবার থাকে *(আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯)*। আর যদি কোনো ব্যক্তির কাছে ঈদের রাত ও দিনের জন্য নিজের এবং যাদের ভরণপোষণ তার উপর ওয়াজিব— তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই না থাকে, তাহলে তার উপর ছাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আল্লাহ কারও উপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না, যা তার সাধ্যাতীত *(আল-বাকারা, ২/২৮৬)*।

প্রশ্ন (৪৪): ফিতরা আদায় করবে কারা এবং কারা বণ্টন করবে? ব্যক্তি নিজেই নিজের ফিতরা হক্বদারকে পৌঁছে দিলে আদায় হবে কি?

-আতাউর রহমান
ঢাকা।

উত্তর: প্রত্যেক মুসলিম (পুরুষ-নারী, ছোট-বড়, স্বাধীন-দাস) যাকাতুল ফিতর আদায় করবেন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের মধ্যে দাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড়— সবার উপর যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন, খেজুর এক ছা‘ অথবা যব এক ছা‘। আর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, মানুষ ঈদের ছালাতে বের হওয়ার আগেই তা আদায় করতে *(ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৪)*। দায়িত্বশীল মুসলিম ব্যক্তি (পরিবারের কর্তা) ছাদাকাতুল ফিতরের বণ্টনের দায়িত্ব পালন করেবেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে এবং যাদের ভরণপোষণ তার উপর বর্তায় (স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা) তাদের পক্ষ থেকেও নিজের সম্পদ থেকে ফিতরা আদায় করবেন। পাশাপাশি ঈদুল ফিতরের ছালাতের আগে ফকীর ও মিসকীনদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশ্বাসযোগ্য দাতব্য সংস্থা, অনুমোদিত দ্বীনী প্রতিষ্ঠান অথবা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করতে পারেন।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা

প্রশ্ন (৪৫): ঈদের ছালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি জানতে চাই।

-ফয়েজ
নোয়াখালী।

উত্তর: ঈদের ছালাত দুই রাকআত। ঈদের ছালাতের সময় শুরু হয় সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে। একদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর রাযিয়াল্লা-হু আনহু লোকদের সাথে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করতে যান। (ছালাত আরম্ভ করতে) ইমাম দেরি করায় তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এ সময় আমরা ঈদের ছালাত আদায় শেষ করতাম *(আবূ দাঊদ, হা/১১৩৫)*। ঈদের ছালাতের পদ্ধতি হলো প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমাসহ সাতটি অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে *(আবূ দাঊদ, হা/১১৪৯; ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০)*। এরপর সূরা ফাতিহা পড়ে সূরা আ‘লা অথবা সূরা ক্বাফ পড়তে হবে। দ্বিতীয় রাকআতে তাকবীরে ক্বিয়াম ছাড়া পাঁচটি তাকবীর বলতে হবে *(আবূ দাঊদ, হা/১১৪৯; ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০)*। এরপর সূরা ফাতিহা পড়ে সূরা গাশিয়াহ অথবা সূরা ক্বামার পড়তে হবে। ছালাত শেষে ইমাম খুৎবা প্রদান করবেন, যাতে তিনি মানুষদের নছীহত করবেন, উপদেশ দেবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যেতেন। তিনি প্রথমেই ছালাত শুরু করতেন। ছালাত শেষ করে ফিরে এসে মানুষের সামনে দাঁড়াতেন আর মানুষ সারিবদ্ধভাবে বসে থাকত। তখন তিনি তাদের উপদেশ দিতেন, নছীহত করতেন এবং নির্দেশনা দিতেন। আর যদি কোনো বাহিনী পাঠানোর বা কোনো নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন হতো, সেটিও তিনি দিতেন, তারপর ফিরে যেতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৮৯)*।

প্রশ্ন (৪৬): ঈদের তাকবীরে কী বলতে হবে এবং কখন থেকে কখন পর্যন্ত তাকবীর দিতে হবে?

-মো. রিফাত
খুলনা।

উত্তর: ক. ঈদের তাকবীরে বলা হবে, لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা,*

www.al-itisam.com

হা/৫৬৫১, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গলীল, ৩/১২৫)। খ. ঈদুল ফিতরের চাঁদ উদিত হওয়ার পর থেকে ঈদের ছালাত পর্যন্ত উক্ত তাকবীর পাঠ করা হবে। ঈদুল আযহাতে যিলহজ্জ মাসের ১ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত উক্ত তাকবীর সাধারণভাবে যেকোনো সময় পাঠ করা যাবে। তবে বিশেষভাবে গুরুত্বসহ উক্ত তাকবীর পাঠ করা হবে যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের ফজর থেকে নিয়ে ১৩ তারিখের আছর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর *(আল-বাকারা, ২/১৮৫ ও ২০৩; তাফসীরে কুরতুবী, ৩/৪; ছহীহ বুখারী, ২/২০)*।

প্রশ্ন (৪৭): আমাদের গ্রামে ঈদের দিন খেলাধুলার আয়োজন করা হয় এবং গ্রামবাসীর কাছ থেকে টাকা তুলে পুরস্কার দেওয়া হয়। এরকম আয়োজন করা যাবে কি?

-মোহাইমিনুল ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর: বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে ঈদ উপলক্ষ্যে যেসব খেলাধুলার আয়োজন দেখা যায় তা একাধিক কারণে জায়েয নয়। যেমন- ১. খেলাগুলো শরীআতসম্মত হয় না। ২. উচ্চ আওয়াজে গান বাজানো হয় ও প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়া হয়। ৩. নারী-পুরুষের অবাধ অংশগ্রহণ থাকে। ৪. চাপ সৃষ্টি করে টাকা উত্তোলন করা হয়।

তবে ঈদের দিন বৈধ উপায়ে কাউকে কষ্ট না দিয়ে হালাল খেলাধুলার সুযোগ রয়েছে। টাকা উঠিয়ে যদি হার-জিতের পুরস্কার দেওয়া হয় তাহলে জুয়া হবে, খেলায় অংশগ্রহনকারীদের টাকা দিয়ে পুরস্কার দেওয়া যাবে না। তৃতীয় পক্ষ বা স্পন্সর নিয়ে পুরস্কার দিলে সমস্যা নেই। তবে অংশগ্রহণকারীরা টাকা উঠিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলে সমস্যা নাই।

প্রশ্ন (৪৮): ঈদের ছালাত যদি কারো ছুটে যায়, তাহলে সে কী করবে? সে কি কাযা আদায় করতে পারবে?

-কাবিরুল ইসলাম
খুলনা।

উত্তর: ঈদের ছালাত ছুটে গেলে দুই রাকআত কাযা আদায় করে নিবে। কাযা ছালাত ঈদের ছালাত আদায়ের পদ্ধতিতেই আদায় করবে। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ অধ্যায় রচনা করেছেন, ‘কারো ঈদের ছালাত ছুটে গেলে সে দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে’। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু যাবিয়া নামক স্থানে তার আযাদকৃত গোলাম ইবনু আবূ উতবাকে এ আদেশ করেছিলেন। তাই তিনি তার পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে শহরের অধিবাসীদের ন্যায় তাকবীরসহ ছালাত আদায় করেন এবং ইকরিমা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, গ্রামের অধিবাসীরা ঈদের দিন সমবেত হয়ে ইমামের ন্যায় দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে। আত্বা রহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন কারো ঈদের ছালাত ছুটে যায়, তখন সে দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে *(ছহীহ বুখারী, ২/২৩)*।

প্রশ্ন (৪৯): আমাদের এলাকায় ঈদের ছালাত শেষে সকলে সালাম দেয়, মুসাফাহা করে, হাদিয়া দেয় এবং কোলাকুলি করে। এরকম কোনো আমল ছাহাবীদের মাঝে ছিল কি?

-মইনুল ইসলাম
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করার বিষয়ে কোনো আমল ছাহাবীদের মাঝে পাওয়া যায় না, বরং তা বিদআত। ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরামের পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ ‘তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা’ অর্থাৎ ‘আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হতে কবুল করুন!’ *(বায়হাক্বী, হা/৬২৯৫; আল-মু‘জামুল কাবীর, হা/১২৩; তামামুল মিন্নাহ, ১/৩৫৪)*। ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পর সাক্ষাৎ হলে মুসাফাহা করতেন আর সফর থেকে আসলে পরস্পর কাঁধে কাঁধ লাগাতেন *(সিলসিলাতুল আহাদিছিস ছহীহাহ, হা/২৬৪৭; আল-মু‘জামুল আওসাত্ব, হা/৯৭)*। আর ইসলামে পরস্পরকে হাদিয়া দিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/২৫৮৫)*।

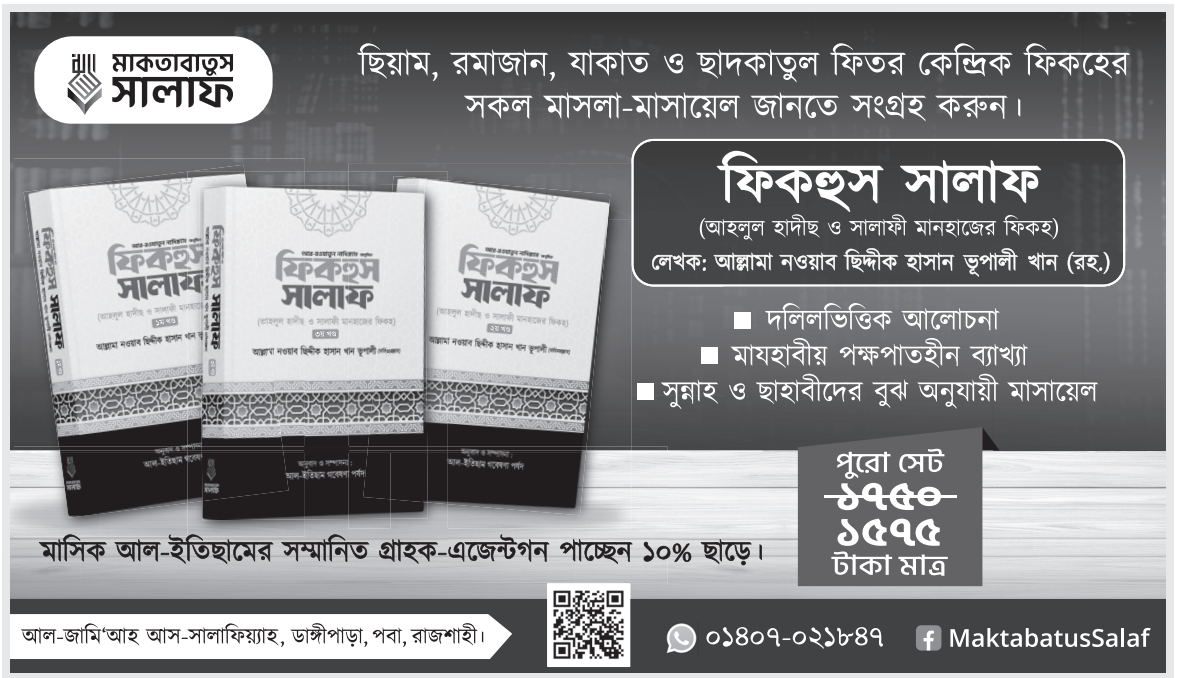
পারিবারিক বিধান

প্রশ্ন (৫০): একজন ব্যক্তি হাসি-ঠাট্টার ছলে এক মাসের মধ্যে স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়, পরে তারা স্বাভাবিকভাবে সংসার করে। কয়েক মাস পর আরও এক তালাক দেয়। এখন তারা একসঙ্গে থাকতে চায়। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে এই তালাকগুলো কি কার্যকর হয়েছে এবং তাদের একসঙ্গে থাকা বৈধ কি-না? তাদের করণীয় কী?

-আমির হামযা
চককীর্ত্তি, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: তালাক আল্লাহ তাআলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, যা নিয়ে খেল-তামাশা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর

তোমরা আল্লাহর বিধানসমূহকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়ো না' *(আল-বাকারা, ২/২৩১)*। সুতরাং কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হাসি-ঠাট্টার ছলে তালাক প্রদান করলেও তা তালাক বলে গণ্য হবে। নবী ﷺ বলেন, ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعُ 'তিনটি বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে বললেও এবং ঠাট্টাচ্ছলে বললেও যথার্থ বলে বিবেচিত হবে। বিয়ে, তালাক ও রাজআত (তালাক প্রত্যাহার)' *(তিরমিযী, হা/১১৮৪)*। আর এক বৈঠক তথা এক মাসিকের মাঝে যত তালাকই দেওয়া হোক না কেন তা এক তালাক বলেই গণ্য করা হবে *(ছহীহ মুসলিম, হা/৩৫৬৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৮৭)*। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি যেহেতু এক মাসে দুই তালাক প্রদান করেছে সুতরাং তা এক তালাক বলে গণ্য হবে। এরপর সংসার করার কয়েক মাস পর আবার এক তালাক প্রদান করেছে তা দ্বিতীয় তালাক বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং এ পর্যন্ত তার দুই তালাক হয়েছে। এমতাবস্থায় তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তালাক দুই বার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে' *(আল-বাকারা, ২/২২৯)*। তবে এরপর তালাক দিলে স্বাভাবিকভাবে ফিরিয়ে নেওয়ার আর সুযোগ থাকবে না।





রামাযানের শুভেচ্ছা ১৪৪৭

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচি

হিজরী: ১৪৪৭ | ঈসায়ী: ২০২৬ | বঙ্গাব্দ: ১৪৩২

ঢাকার জন্য

তারিখ			বার	সাহারীর শেষ সময় ঘণ্টা-মিনিট	ইফতারের সময় ঘণ্টা-মিনিট
হিজরী	ঈসায়ী	বঙ্গাব্দ			
১ রামাযান	১৯ ফেব্রুয়ারি	০৬ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	০৫:১৩	০৫:৫৬
২ রামাযান	২০ ফেব্রুয়ারি	০৭ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৫:১২	০৫:৫৭
৩ রামাযান	২১ ফেব্রুয়ারি	০৮ ফাল্গুন	শনিবার	০৫:১২	০৫:৫৮
৪ রামাযান	২২ ফেব্রুয়ারি	০৯ ফাল্গুন	রবিবার	০৫:১১	০৫:৫৮
৫ রামাযান	২৩ ফেব্রুয়ারি	১০ ফাল্গুন	সোমবার	০৫:১০	০৫:৫৮
৬ রামাযান	২৪ ফেব্রুয়ারি	১১ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:০৯	০৫:৫৯
৭ রামাযান	২৫ ফেব্রুয়ারি	১২ ফাল্গুন	বুধবার	০৫:০৯	০৫:৫৯
৮ রামাযান	২৬ ফেব্রুয়ারি	১৩ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	০৫:০৮	০৬:০০
৯ রামাযান	২৭ ফেব্রুয়ারি	১৪ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৫:০৭	০৬:০০
১০ রামাযান	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৫ ফাল্গুন	শনিবার	০৫:০৬	০৬:০১
১১ রামাযান	০১ মার্চ	১৬ ফাল্গুন	রবিবার	০৫:০৫	০৬:০২
১২ রামাযান	০২ মার্চ	১৭ ফাল্গুন	সোমবার	০৫:০৫	০৬:০২
১৩ রামাযান	০৩ মার্চ	১৮ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:০৪	০৬:০৩
১৪ রামাযান	০৪ মার্চ	১৯ ফাল্গুন	বুধবার	০৫:০৪	০৬:০৩
১৫ রামাযান	০৫ মার্চ	২০ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	০৫:০৩	০৬:০৩
১৬ রামাযান	০৬ মার্চ	২১ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৫:০১	০৬:০৪
১৭ রামাযান	০৭ মার্চ	২২ ফাল্গুন	শনিবার	০৫:০০	০৬:০৪
১৮ রামাযান	০৮ মার্চ	২৩ ফাল্গুন	রবিবার	০৪:৫৯	০৬:০৫
১৯ রামাযান	০৯ মার্চ	২৪ ফাল্গুন	সোমবার	০৪:৫৮	০৬:০৫
২০ রামাযান	১০ মার্চ	২৫ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৪:৫৭	০৬:০৬
২১ রামাযান	১১ মার্চ	২৬ ফাল্গুন	বুধবার	০৪:৫৬	০৬:০৬
২২ রামাযান	১২ মার্চ	২৭ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	০৪:৫৫	০৬:০৭
২৩ রামাযান	১৩ মার্চ	২৮ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৪:৫৪	০৬:০৭
২৪ রামাযান	১৪ মার্চ	২৯ ফাল্গুন	শনিবার	০৪:৫৩	০৬:০৮
২৫ রামাযান	১৫ মার্চ	০১ চৈত্র	রবিবার	০৪:৫২	০৬:০৮
২৬ রামাযান	১৬ মার্চ	০২ চৈত্র	সোমবার	০৪:৫১	০৬:০৮
২৭ রামাযান	১৭ মার্চ	০৩ চৈত্র	মঙ্গলবার	০৪:৫০	০৬:০৯
২৮ রামাযান	১৮ মার্চ	০৪ চৈত্র	বুধবার	০৪:৪৯	০৬:০৯
২৯ রামাযান	১৯ মার্চ	০৫ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	০৪:৪৮	০৬:০৯
৩০ রামাযান	২০ মার্চ	০৬ চৈত্র	শুক্রবার	০৪:৪৭	০৬:১০

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া (www.bmd.gov.bd) | ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org) | গণনা পদ্ধতি: University of Islamic Science, Karachi

নোট: এই সময়সূচি সংশ্লিষ্ট জেলার কেন্দ্রীয় অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ভৌগোলিক কারণে জেলার পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের সময়ের মধ্যে ১-২ মিনিটের পার্থক্য হতে পারে। আপনার বর্তমান অবস্থানের (গ্রাম/থানা/ইউনিয়ন) একদম নির্ভুল সময় জানতে ফোনের GPS/Location চালু রেখে নিচের QR Code টি স্ক্যান করুন।

সাহরির সময়ের জন্য :
https://www.google.com/search?q=sehri+time+today+near+me

ইফতারের সময়ের জন্য :
https://www.google.com/search?q=sunset+time+today+near+me

বি.দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগের নির্ণীত অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য জেলাসমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণে অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচি দেখানো হয়েছে।

জেলাভিত্তিক সময়সূচি [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
নরসিংদী	-১	-১	-১	-১
গাজীপুর	০	০	০	০
শরিয়তপুর	০	+১	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	-১	০	০	০
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	-২	-২	-১	-১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	০
রাজবাড়ী	+৩	+৫	+৫	+৪
মাদারীপুর	+১	+২	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩
ফরিদপুর	+১	+৩	+৩	+২

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+৩	+২	+২	+২
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৪	+৪	+৪	+৪
রাজশাহী	+৭	+৭	+৭	+৭
নাটোর	+৫	+৫	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৫	+৫	+৫	+৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৮	+৯	+৯
নওগাঁ	+৬	+৫	+৬	+৬

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
যশোর	+৫	+৬	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৫	+৬	+৬	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৭	+৬
কুষ্টিয়া	+৬	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৫	+৪	+৪
বাগেরহাট	+৩	+৪	+৩	+৩
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
ঝালকাঠি	+১	+২	+২	+১
পটুয়াখালী	০	+১	+১	+১
পিরোজপুর	+১	+৩	+৩	+২
বরিশাল	০	+১	+১	০
ভোলা	-১	০	+০	-১
বরগুনা	+১	+৩	+২	+১

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
পঞ্চগড়	+৭	+৬	+৭	+৭
দিনাজপুর	+৫	+৬	+৬	+৭
লালমনিরহাট	+৩	+৩	+৩	+৪
নীলফামারী	+৫	+৫	+৬	+৬
গাইবান্ধা	+৩	+২	+৩	+৩
ঠাকুরগাঁও	+৮	+৬	+৭	+৮
রংপুর	+৪	+৪	+৪	+৫
কুড়িগ্রাম	+৩	+২	+৩	+৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৪	-৩	-৩	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৪	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৭	-৬	-৬	-৭
নোয়াখালী	-৩	-২	-২	-২
চাঁদপুর	-২	০	-১	-১
লক্ষ্মীপুর	-২	-১	-২	-২
চট্টগ্রাম	-৬	-৪	-৫	-৫
কক্সবাজার	-৬	-৪	-৫	-৬
খাগড়াছড়ি	-৬	-৬	-৬	-৭
বান্দরবান	-৮	-৬	-৬	-৭

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
শেরপুর	+১	+১	+১	+১
ময়মনসিংহ	০	-১	০	০
জামালপুর	+২	+১	+২	+২
নেত্রকোণা	-২	-২	-১	-১

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার ১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিলেট	-৬	-৭	-৬	-৬
মৌলভীবাজার	-৬	-৬	-৬	-৬
হবিগঞ্জ	-৪	-৪	-৪	-৪
সুনামগঞ্জ	-৪	-৫	-৪	-৪

সাহল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন,'যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে; ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮)।

'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে (সহিহ মুসলিম, হা/২০২২; তিরমিজি, হা/৩৪৫৮)।

ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দুআ পড়া যাবে– যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়াজাবাল আজর ইনশাআল্লাহ (আবূ দাউদ, হা/২৩৫৭)

আবূ হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত ছওয়াবের আশায় রামাদানের রাত্রিতে তারাবীহর ছালাত আদায় করবে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে (সহিহ বুখারি, হা/৩৭; সহিহ মুসলিম, হা/৭৫৯)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান : আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

দেশ ব্যাপী মক্তব পরিচালনা, মসজিদ নির্মাণ ও আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর সার্বিক কাজ পরিচালনার জন্য

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পি. রাজশাহী শাখা

Ac/Name : Moktob Fund
Ac/No : 20507770100658423
মক্তব ফান্ড: ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮
মক্তব ফান্ড: ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮-৭

Ac/Name : Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Ac/No : 20501130204367316

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে নিম্নোক্ত হিসাব নম্বরগুলি ব্যবহার করুন

Ac/Name : Al Jamiah As Salafiya Zakat Fund
Ac/No : 20501130204367417
Swift Code : IBBLBDDH113
Routing No: 125811932

(পারসোনাল) ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫
(মার্চেন্ট) ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (বিকাশে ৪.৭% অপশন থেকে পেমেন্ট করতে হবে)
(পারসোনাল) ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮-৭
(পারসোনাল) ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

সৌজন্যে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
মোবা: ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫

প্রচারে: আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। মোবা : ০১৪০৭-০২১৮১৪-১৫

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা মাসিক আল-ইতিছাম পড়ুন!
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত

প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১

নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০

নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩

নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬

বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩

বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭

বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বিরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫